উপন্যাস সিরিজের ষোড়শ সংখ্যা

অনিমন্ত্রিতা।

শ্রীনরেন্দ্র লাল গঙ্গোপাধ্যায়।

১লা পৌষ, ১৩২৭।

শিশির পাবলিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক।
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস্
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর,
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস
২৪২-১, অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা।

উপহার

শ্রীমতী হৈমবতীকে

দিলাম।

কায়া হইতে ছায়া লইয়া মায়া গড়িয়া দিলাম।
এ মায়ার অবিনশ্বর সত্যে মিথ্যাটুকু লুপ্ত হোক্।

নরেন।

অনিমন্ত্রিতা।

১

পাড়ার সকলেই একবাক্যে বলিত, "এমন ছ'টী আর হয় না, যেন হরিহর এক আত্মা"। ছেলেবেলা হইতে তাহারা যেন গলাগলি করিয়াই দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। খেলাধুলার চিরসঙ্গী, আহারে বিহারে সর্ব্বত্রই তাহারা এমনভাবে আপনাদের হৃদয় দুটীকে গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে ধরিয়া রাখিত, যে পাড়ার শিক্ষিত পুরুষমহলে ড্যামন্ ও পিথিয়াস্ এবং হারমোডিয়াস্ ও এরিষ্টোজিটনের প্রসঙ্গ তুলিয়া এবং বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা তাহাদের চিরপুরাতন রামলক্ষ্মণের উদাহরণ পাড়িয়া এই দুটী প্রাণের স্বাভাবিক প্রণয়টুকুর মহিমা শতগুণে উজ্জ্বল করিয়া দিত। দুজনেই দুজনের সঙ্গলাভে এতটা পাইত যে, তাহারা যে তাহাদের অজ্ঞাতে সমস্ত পৃথিবীটা হইতে আল্‌গা হইয়া পড়িতেছে বলিয়া সর্ব্বত্রই একটু মৃদু আন্দোলন হইত, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার ইচ্ছা বা সময় তাহাদের ছিল না। তাহাদের পড়াশুনা, খেলাধুলা, জল্পনা কল্পনা শুধু তাহাদের এই দুটী প্রাণের বেষ্টনী লইয়া যে ক্ষুদ্রসীমাটুকু অচিরেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, কোনদিন সে সীমাপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস তাহাদের মনে আসে নাই। তাই যখন বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে

তাহাদের বিকাশোন্মুখ বুদ্ধির উপর সংসারের কিছু কিছু দাবী পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা যেন ব্যবধান আশঙ্কায় জোরের সহিত সে দাবী উপেক্ষা করিয়া আরও নিকটে ঘেঁসিয়া আসিয়া একেবারে পূর্ব্বের মতই ফাঁকা হইয়া রহিল।

কিন্তু চিরটাকাল যে ঠিক এই একইভাবে একবৃন্তে দু'টীফুলের মত কাটিয়া যাইতে পারে না, এই ভয়াবহ সত্যটার প্রথম আভাস সুধী ও অরুণ দুইজনেই পাইল, যখন গ্রামের স্কুল হইতে একসঙ্গে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিয়া উভয়ে এফ্,এ পড়ার উদ্যোগ আরম্ভ করিল। অরুণের সাংসারিক অবস্থা ভাল এবং কলিকাতায় তাহার দাদার বাসায় থাকিয়া পড়িতে পারিবে বলিয়া তাহার পড়া সম্বন্ধে যেমন কোন চিন্তার কারণ থাকিতে পারে না, সুধীর সাংসারিক দুরবস্থার কথা মনে করিয়া তাহার পিতামাতা কিন্তু পুত্রের পড়া চালাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া একটু বিশেষরকম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অতিকষ্টে যখন অরুণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, কলিকাতার বাসায় থাকিয়া সুধীর পড়া চলিতে পারে না, তখন সে দুর্ভাগার মতই অনেক সান্ত্বনার মাঝে বিচ্ছেদের দুঃখটাকে কোনরূপে বরণ করিয়া লইয়া একাকী কলিকাতায় চলিয়া আসিল। আসিবার সময় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইলেও সে বন্ধুকে বারবার বলিয়া আসিতে ভুলিল না যে, সে যেখানেই থাকে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকট যেন দুইখানা করিয়া চিঠি লিখে।

কলিকাতায় আসিয়া বিচ্ছেদের দুঃখটা যে কি প্রবলভাবে তাহাকে আঘাত করিয়াছে এই মর্ম্মে বারবার চিঠি লিখিয়াও যখন সুধীর নিকট হইতে একছত্রও না পাইয়া অরুণ বিস্ময়ে অবাক্ ও মর্ম্মাহত হইতেছিল,

এই সময় একদিন হঠাৎ তাহার মার এক চিঠিতে খবর আসিল যে, সুধীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সে বিশ্বাস করিল না; এমন একটা অসম্ভব ভাগ্য যে সূচনা না করিয়াই হঠাৎ কাহারও ঘাড়ে আসিয়া চাপিতে পারে, ইহা তাহার সম্পূর্ণ ধারণার অতীত। কিন্তু কিছুদিন পরে সুধীর নিজেরই চিঠিতে বিপুল আক্ষেপোক্তির ভিতর হইতে এই উড়াইয়া দেওয়া কথাটাই অত্যন্ত লাজুকের মত যখন সসঙ্কোচে বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর অবিশ্বাস করিবার জো ছিল না। অরুণ চিঠি পড়িয়াই বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ আবল-তাবল ভাবিবার পর সে দেখিল যে, শত অসম্ভব মনে হইলেও এ ব্যাপারটা জগতে এমন নির্ব্বিবাদে হইয়া যাইতেছে যে ইহার ভিতরে তিলমাত্র বিচিত্রতা নাই, বরং এই সম্ভাবনাটার জন্য তাহার প্রস্তুত হইবার সময় হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ত প্রস্তুত হইবার সময় দেওয়া হয় নাই; এ যে অকস্মাৎ উল্কাপাতের মত আসিয়াই একেবারে ধ্বংস ও বিপর্য্যয় দ্বারা তাহার মনের দেশ তোলপাড় করিয়া ফেলিয়াছে। সুধীর বিবাহ যে তাহার পক্ষে কি ভয়ানক অর্থপূর্ণ, এই কথাটাই তাহার মনে বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। তাহাদের ভিতরে যে প্রণয়ের বন্ধন ছিল সেটা যে শুধু ছিন্ন হইয়া গেল তাহা নহে, অপর একজনকে সে প্রণয় সম্পূর্ণরূপে অযাচিতভাবে দেওয়া হইল। আর, এই নূতন অধিকারী নারীজাতির নিশানা লইয়া এমনই একটা আভিজাত্যের অভিমান লইয়া আসিল, যে তাহার দাবী ন্যায্য কি অন্যায় তাহা বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়াই, এমন কি, হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধীকে তাহার ভালবাসার সমস্তটুকু নিঃশেষ করিয়া তাহাকে দিতে হইবে। ইহাতে কি তাহার উপর অবিচার করা হইবে না? তাহার পাওনার সঙ্গে সঙ্গে যে

একটা রেজেষ্টারী না করা মৌরসীপাট্টার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার অবমাননায় কি একদিকে সুধীর পক্ষে বিশ্বাস ঘাতকতা হইল না? আর সুধীই বা এমন একটা কাজে কিরূপে স্বীকৃত হইল? সে ত বুঝে, ইহার অর্থ অরুণের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। সেও তবে স্বার্থেরই সেবা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই? এতটা ক্ষুদ্রপ্রাণ! একটা প্রবল বিতৃষ্ণায় অরুণের সমস্ত দেহটা যেন কুঞ্চিত হইয়া গেল।

এ ব্যাপারটার যে একটা বোঝাপড়া হইতে পারে, তাহা অরুণের বিশ্বাসযোগ্য সহজে না হইলেও যে কোন একটা মীমাংসা শীঘ্রই হয়ত হইয়া যাইত, এবং পরপর পত্রস্রোতে সুধীর অনুতাপ, তাহার তদানীন্তন নিরুপায় অবস্থা, শ্বশুরের সাহায্যে পড়াশুনার ইদানীং সুবিধা এবং সর্ব্বোপরি ক্ষমার জন্য সানুনয় ব্যাকুল অনুরোধ, ইত্যাদির প্ররোচনায় সে যে শীঘ্রই এই অসঙ্গত ব্যাপারটাকে স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার তাহার পুরাতন দুর্দ্দমনীয় দাবী লইয়া উপস্থিত হইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ থাকিত না, যদি না তাহাকে শেলটা নূতন করিয়া আবার বিঁধিত। পূজার ছুটিতে যখন উভয়েই বাড়ী আসিল, (সুধী রংপুরে তাহার মুন্সেফ শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া পড়িত), তখন নীলিমাও সেইখানে তাহার শ্বশুরালয়ে। কাঁটাটা যখন এত নিকটে তখন যে সেটা বিঁধিবেই, তাহা সুধী ভাবিয়া দেখে নাই। বিচ্ছেদের পর বন্ধুর সহিত পুনর্মিলনের আশা ও আনন্দে সে এবং অরুণ উভয়েই এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাড়ী আসিয়া নীলিমার প্রকাশ্য অধিকারের মলিন ছায়াটা তাহাদের উপর পড়িতেই তাহারা অকস্মাৎ চক্রাচ্ছাদিত সূর্য্যদৃষ্টে অর্জ্জুনের মতই বিবর্ণ হইয়া পড়িল। সেইমুহূর্ত্তে দুইজনের ভিতরে যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর

ধীরে ধীরে নিজের সত্তা জাগাইয়া তুলিতেছিল, তাহার নিদর্শন সুধীর লাজারুণ মুখে,—এবং অরুণের দুঃসাধ্য ক্ষমার বৃথা আভাস লইয়া যে একটা সকরুণ দৃষ্টি অর্থশূন্য উদাসভাবে ফুটিয়া উঠিত, তাহাতেই বিলক্ষণ পাওয়া যাইত। তাই যখন "সুধীরের বৌ"কে দেখিবার অশ্রান্ত নিমন্ত্রণ বারবার স্নেহপূর্ণ অছিলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া অরুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সুধীর ঝটিকার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা অনুভব করিত।

২

মানুষের ভিতরে এমন একটা জাগ্রত প্রচেষ্টা আছে যে, যে বিপদটা নিতান্তই দুর্ব্বহ তাহার প্রথম বেগটা সহিয়া গেলে তারই ভিতর হইতে অবলম্বনের উপযুক্ত কতকগুলি সরল কারণ বাহির করিয়া মানুষ তাহারই উপর ভর দিয়া নূতন শক্তি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে অরুণেরও তাহাই হইল। সুধীরের বিবাহিত জীবনের অর্থটা যখন পূর্ণমাত্রায় তাহার বিষ ঢালিয়া দিয়া অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় পরিণত হইল, তখন তাহা হইতে মধুক্ষরণের সম্ভাবনা অরুণের মনে প্রবল আশা জাগাইয়া তুলিল। সে ভাবিল, বেশত, ইহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? আমার ভালবাসা ত আর সঙ্কীর্ণ নহে। যাহা সুধীর প্রাপ্য তাহা সুধীর স্ত্রীরই বা প্রাপ্য হইতে দোষ কি? আমি সুধীকে ভালবাসিতে পারি, আর সুধী যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিতে পারি না? ইহাও কি সম্ভব? এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা এবং সে যে প্রাণে প্রাণে সুধীর বৌকেও ভালবাসে এইরূপ একটা বিশ্বাস তাহাকে শান্তির বাতাস আনিয়া দিল।

এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি গাঁথিয়া সে আবার তাহার ভাঙ্গা-মনকে গড়িয়া তুলিতে মন দিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল, যে ভিত্তিটা নিতান্তই কোমল; তাই তাহার কেবলই আশঙ্কা হইতে লাগিল, যদি তাহার এই শেষ অবলম্বনটুকুকে সে ধরিয়া রাখিতে না পারে, যদি যে মানসী-মূর্ত্তি গড়িয়া সে সুধীরের বৌর উপযুক্ত সমস্ত উপাদান তাহাতে দিবে, তাহা একান্তই মনগড়া এবং আসল সত্যটার সহিত একেবারে বিসদৃশ হইয়া পড়ে! তাহা হইলে কি সে এই নকল ভালবাসাটাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে? এইরূপ একটা আশঙ্কায় অরুণ অত্যন্ত উৎপীড়িত বোধ করিতে লাগিল। তাই পরীক্ষা করিয়া ইহার একটা যথার্থ মীমাংসা করিবার জন্য সে একটু উৎসুকও হইয়া পড়িল।

এ পরীক্ষার একটা সুযোগও অচিরেই মিলিল। সুধীর বি, এ পরীক্ষা দিয়াই তাহার শ্বশুরের আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পশ্চিমের হাওয়ায় পাঠ-ক্লিষ্ট দেহটাকে জুড়াইতে চলিয়া গেলে অরুণ বাড়ী আসিল। বাড়ীতে আসিয়া প্রথম খবরই যাহা পাইল, তাহাতে তাহার মানসিক উত্তেজনা একটু বাড়িয়া উঠিল। নীলিমাকেও কিছু-দিন হইল আনা হইয়াছে শুনিয়া সে একটু জিদের সহিতই সুধীর দিদিকে গিয়া বলিল, "আজ চার বচ্ছর ধরে' বৌ দেখাবে, বৌ দেখাবে কর্চ্ছ, দেখাবার বেলা ত খুঁজেও পাওয়া যায় না দেখি। খুব ভাঁড়াতে জান যা'হোক্।" এই নূতন ইচ্ছাটা যে একবারে আকস্মিক এবং অভিনব তাহাতে কাহারও বিস্ময়ের উদ্রেক করিল না, বরং সুধীর দিদি যে ইহা শুনিয়া একটু মৃদুমন্দ হাসিল, তাহার অর্থটা স্পষ্টই এইরূপ মনে হইল যে 'সুধীর বৌকে না দেখিয়া তুমি আর কতদিন জিদ্ ধরিয়া থাকিবে?

তোমাকে ত আর আমরা চিনি না!' এই উপহাসের হাসিটা বরদাস্ত করিয়া লইয়া অরুণ বধূ দেখিয়া চলিয়া আসিল। এই দর্শন উৎসব এত সহজে এবং এত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল যে, ইহা লইয়া আর বিশেষ করিয়া ভাবিবার কিছু রহিল না। তথাপি সে জোর করিয়া ইহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, বধূর ঘোমটা তুলিয়া দেখাইবার সময় সুধীর দিদি যখন তাহার সাগ্রহ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কি, দেখা হ'ল?" তখন সে একটা জোরের সঙ্গে "না" করিতেই নীলিমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া ঘোম্‌টাটা জোর করিয়া টানিয়া দিয়াছিল। এই একটু সামান্য আভাসের উপর সে তাহার কল্পিত লাবণ্যময়ীর মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

কিন্তু ইহাতে বড় বেশী দিনের খোরাক জুটল না। একে একে দুই, ইহা লইয়া তো আর সমগ্র অঙ্কশাস্ত্র কল্পনা করা চলে না। তাই সে প্রায়ই দুই একদিন অন্তর সুধীদের বাড়ী যাইতে লাগিল। সুধীর ছোট দুইটী বোন ছিল। তাহাদেরই মধ্যস্থতায় ক্রমে ক্রমে একটু আধটু আলাপের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। এই পরিচয়টাকে ঘনিষ্ট করিয়া লইতে অরুণের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। আহারান্তে সুধীর বৌর হাতে কাঁটা সুপারি না হইলে তাহার চলিবে না; গ্রীষ্মের দীর্ঘ অলস দুপুরগুলাকে কাটাইবার একমাত্র উপায় সুধীর বৌর সহিত তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যস্থতায় কথা কহা; পিপাসা লাগিলে সুধীর বৌর হাতে জল না খাইলে তাহার পিপাসা মিটিবে না; তাহার বালিশ চুরি করিয়া সে তাহাতে মাথা রাখিয়া শুইবে;—এইরূপ শত অছিলায় সে

সেই ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়াইতে লাগিল। ঘাটে জল আনিতে যাইবার পথে বাধা দিয়া, রাঁধিবার সময় হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকিয়া, খাইবার সময় সহসা আবির্ভূত হইয়া, এমন কি, রাত্রে ঘুমাইলে দরজার শিকল নাড়িয়া জাগাইয়া তাহার সহিত সম্বন্ধটা জোর করিয়া সে আপনার করিয়া লইতে লাগিল। সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে সে এই কৌতুকটাকে জাগাইয়া রাখিল। নীলিমা ঘোমটার আড়ালে যখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে, যখন ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কয়, ঘোমটার ভিতরে তাহার দোদুল্যমান নোলক যখন দেখিতে পাওয়া যায়, সুধীরের ছোটভাইকে দিয়া তাহার মাথার কাপড় ফেলিয়া দেওয়ায় সে যখন নিরুপায় হইয়া দুই করে তাহার লাজ-রক্তিম মুখখানাকে ঢাকিয়া রাখে, তখন অরুণের মনে কেমন একটা আনন্দের সঞ্চার হয়; সে মুগ্ধ উপাসকের মত তাহার উপাস্য-দেবতার ঐশ্বর্য্যগুলি কলকণ্ঠমুখরিত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দেখিয়া লয়।

এই যে ঘনিষ্ট মিশামিশি ইহার ভিতরে একটা বাঁধা সর্ব্বদাই জাগিয়া ছিল। অরুণ জানিত, তাহার ভাব উপাসকের ভাবের মত শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ। তাই সুধীর বৌ যাহাতে তাহার নিকট কোন প্রকারে খাটো না হইয়া যায়, সেজন্য তাহার একটা ব্যাকুল ইচ্ছা ও আশঙ্কা ছিল। তাই যত ঘনিষ্টতাই হউক না কেন, তাহার নিজকৃত একটা স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। কাজেই সে সুধীর বৌর মুখ দেখা, তাহাকে স্পর্শ করা, অথবা তাহার উচ্চারিত কথা শুনা প্রভৃতি পছন্দ করিত না;—একটা অসম্ভব শিল্পীর অসম্ভব প্রতিভাবিকাশের মতই ত সে তাহাকে নিকটে অথচ দূরে রাখিয়া, সত্য অথচ কাল্পনিক লাবণ্যের আধার করিয়া সুধীর বৌর যোগ্য আসনে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে চায়!

আবার গোড়া হইতেই আর একটা দিকও ভাবিয়া দেখা উচিত। অরুণ প্রথম হইতেই যেন সন্দেহ করিতেছিল, ইহার মধ্যে নৈতিক গলদও থাকিবার সম্ভাবনা। তাই তাহার দাদা যখন একদিন ডাকিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "অরুণ, তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন,—পরমহংসদেব বল্‌তেন, আগুনের কাছে ঘি যত জমাটই হোক্ গল্‌বেই গল্‌বে," তখন সে নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবেই একটু বেশী গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিন্তু সে কোন তাৎপর্য্য অথবা মীমাংসা স্থির করিতে পারিল না। হ'তে পারে, Platonic friendshipটা একেবারেই একটা অনাসৃষ্টি কল্পনা। কিন্তু তার ত আর তা' নয়। তাহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে তাহার দূর দিয়া চলাই দরকার; সে ত স্বেচ্ছায়ই কাছে ঘেঁসিবে না, তাহাতে তাহার নিজেরই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তাহার এমন বিশুদ্ধ উপাসনাটার সঙ্গে নৈতিক দোষ জড়াইবার সম্ভাবনা যে কোনক্রমেই থাকিতে পারে না, তাহা তাহার অপেক্ষা বেশী আর কে বুঝিবে?

যখন মানুষের মনে একটু ধান্দা থাকে, তখন সাধারণতঃ ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত কাকের মত তাহার বুদ্ধিমত্তার অভিমানটা নিজের কাছেই বেখাপ্পা মানাইলেও তারই উত্তেজনায় সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিয়া চলে, তখন শুধু থামিতে চাহিলেও থামাটাই তাহার পক্ষে বেশী দুঃসাধ্য। অরুণ যখন এই রসাল উপাসনাটা খুব জাঁকাইয়া তুলিয়া একটা বিমল আনন্দ এবং বেশী ভালবাসিতে পারার একটা গৌরব অনুভব করিতে-ছিল, তখন যে চিন্তাটা তাহার মনে অনুক্ষণ জাগিয়া উঠিত, সেটা নৈতিক অথবা সামাজিক আশঙ্কা নহে; কিন্তু যাহাকে সম্মুখে রাখিয়া

সে এত বড় একটা ভালবাসার আদর্শে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার এ সম্বন্ধে মতামত ও মনোভাবটা জানিবার জন্যই অরুণ একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। তাহার ব্যবহারে যে সেও সেই রকমই একটা আমোদ উপভোগ করিতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইত, এবং আরও বুঝা যাইত যে, কোনরকম চিন্তা অথবা সমালোচনাই তাহাকে এ আমোদের প্রশ্রয় দিতে বাধা দেয় নাই। কিন্তু শুধু এইটুকুই অরুণ যথেষ্ট মনে করিতে পারিল না। যদি তাই হয়, তবে কেন সে ইহার প্রশ্রয় দিতেছে তাহাও তাহার জানা আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। সে ভাবিল, কেন আমি হঠাৎ তাহাকে এমন স্নেহচক্ষে দেখিলাম, ইহা কি তাহার মনে প্রশ্ন হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার কি উত্তর দিয়াছে? সে যে অরুণের দিক হইতেই এটাকে দেখিতেছে, ইহা তাহার আদৌ বিশ্বাস হইল না। সে উত্তরটা কি হইতে পারে জানিতে তাহার দুর্দ্দমনীয় লোভ জাগিয়া উঠিল।

সেদিন সকাল হইতেই বর্ষার ধারা কেরাণীবাবুদের আফিসে যাইবার মতই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকৃতির দোহাই নিয়া থামিয়া থামিয়া ঝরিতেছিল। সুধীরদের কর্দ্দমাক্ত উঠানে কতগুলি ছেলে কাদায় লোটা-ইয়া তাহাদের শিষ্টতা ও সভ্যতার অভ্রান্ত প্রমাণ দিতেছিল। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর তাহার চিরাভ্যস্ত সুপারি-খাওয়ার পালাটা সারিবার জন্য অরুণ পা টিপিয়া টিপিয়া খড়মের মৃদু শব্দ করিতে করিতে যেই ঠাকুরদালানের জীর্ণ দেউড়িটা পার হইয়া উঠানে এক পা দিয়াছে, অমনি কর্দ্দমাসনে সুখাসীন এক বালক চীৎকার করিয়া উঠিল, "বৌদি", দরজা।" যাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, সে যে শুধু এই ইঙ্গিতটির জন্যই

সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে বিষয়ে বালকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং তাহার বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ সত্য তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য সুধীদের পশ্চিম ভিটার ঘরের দরজাটাও সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। বালকমহলেও একযোগে কোলাহল পড়িয়া গেল, "ওরে, অরুণদা' এসেছে রে, অরুণদা' এসেছে।" এখন যে খুব একটা ভারী রকমের মজা হইবে, ইহা তাহারা স্থির জানিত। তখনই কেহ গিয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিল, "দরজা খোল, বল্‌ছি খোল দরজা, বাঃ আমি বুঝি আর ঘরে যাব না"; কেহ গিয়া জানালার শিক ধরিয়া উঠিয়া ডারউইনের পূর্ব্বপুরুষের অনুকরণে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "কেমন জব্দ! আজ অরুণদা' কখ্‌খনও এখান থেকে যাবে না"; কেহ বা বাহির হইতেই তীব্রভাবে শাসাইয়া উঠিল, "কেমন, এখন সে কথা বলে' দি'! আমাকে ধম্‌কান হয়েছিল কেন?"——— ইত্যাদি। ভিতর হইতেও যে এই ভীষণ আক্রমণের প্রতিবাদ না হইতেছিল, তাহা নহে। গোলাপী ভিতর লইতে হাঁকিয়া উঠিল, "দেখ্‌ গুপে মার খাবি বল্‌ছি। কি কথা বলে দিবি রে পাজি!" প্রভা জানালার নিকট আসিয়া ভুলোর হাতটা টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল, এবং ক্ষীরো জানালা হইতে একমুষ্টি ধূলি নীচে বালকদলে নিক্ষেপ করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অরুণ ছেলেদের ভিতর হইতে একজনকে ইসারা করিয়া ডাকিল। সে কাছে আসিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কচ্ছে রে, হীরে?" হীরেন্দ্র এক গাল হাসি চাপিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া গুমরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দরজায় পিঠ দিয়ে থাচ্ছে। ঐ ছেঁদাটা দিয়ে পিচ্‌কারী

এনে জল দেব ?" বলিয়াই অত্যাচারটার কৌতুক কল্পনা করিয়া সে একেবারে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অন্যদিন যে অরুণ তাহার এই বুদ্ধিমান অনুচরটীর নির্দ্দেশমত কার্য্য করিত, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু আজ সে শুধু বাহির দিক হইতে শিকলটা লাগাইয়া সুধীদের দক্ষিণের ঘরে গিয়া বসিল। এই অপ্রত্যাশিত ক্ষমায় ছেলের দল যেন কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে লম্বা এক হাত ঘোম্‌টা টানিয়া সঙ্গিনীদলপরিবৃতা নীলিমা দক্ষিণের ঘরে আসিয়াই ঘরের এককোণে বসিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে সুপারি কাটিতে লাগিল। অরুণ আজ আর অন্যদিনের মত সুপারির রেকাবটা টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল না; কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনার খুব বিরক্ত বোধ হয়, না ?" প্রভার সহায়তায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?" "এই রকম রোজ রোজ অত্যাচার করি বলে'—।" "না"। এতটুকু উত্তরটায় অরুণ যেন একটু দমিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন না ?" "অত্যাচার কি এই রকমের ?" "এটা কি রকমের ?" অরুণের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রখর হইয়া উঠিল। নীলিমা ঘোম্‌টার নীচে ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এ যে অনুগ্রহ।" অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, সে কি,—কিসের অনুগ্রহ ?" আবার একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া সে বলিল, "স্নেহের"। অরুণ আর দ্বিরুক্তি করিল না; রেকাব হইতে এক থাবা সুপারি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। তাহার কাণে কেবল বাজিতেছিল, "অনুগ্রহ—স্নেহের"।

দেখিতে দেখিতে ছুটির তিন মাস কাটিয়া গেল। পরীক্ষার ফল বাহির

হৈল,—সুধী এবং অরুণ উভয়েই সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অরুণ এইবার এম্, এ পড়িতে কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আসিবার দিন সন্ধ্যার পর সুধীদের দক্ষিণের ঘরে ঢুকিতেই তাহার দিদি বলিল, "অরুণ, তুই যাবি বলে' বৌ যে তোর জন্য একটা কি দেবে বলে ঠিক করে' রেখেছে।" পরক্ষণেই ডাকিয়া বলিল, "ও বৌ, অরুণ এসেছে তোমার কাছে বিদেয় নিতে। শীগ্‌গির এস না।" অমনি কঙ্কণের মৃদু ঝন্‌ঝনানি শুনা গেল। হীরা ও প্রভার পশ্চাতে নীলিমা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে একখানা রুমাল। হীরা বলিল, 'অরুণদা', বৌদি' আপনাকে একখানা রুমাল উপহার দেবে।" নীলিমা দুই তিন হাত দূরে অরুণের সাম্‌নে রুমালখানা ধীরে ধীরে রাখিয়া এক কোণে সরিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অরুণ হাসিয়া উঠিল, বলিল, বাঃ এ ত বেশ, এ ত বেশ উপহার দেওয়া! কে কাকে দেবে কিছু ঠিক নেই,—এ যেন পথে কুড়িয়ে পাওয়া। এ রকম দান আমি নিই না।" সুধীর দিদি হাসিয়া বলিল, "ও মা, হাতে তুলে দাও; আহা বেচারা যে কষ্ট পাচ্ছে দেখ্‌ছ না।" নীলিমা আবার ধীরে ধীরে আসিয়া রুমালখানা তুলিয়া লইয়া অরুণের প্রসারিত হস্তে ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিবার সময় তাহার করাঙ্গুলি অরুণের হস্ত মৃদুস্পর্শ করিল। নীলিমা অমনি হাসিয়া ফেলিল এবং হাসি চাপিতে চাপিতে তাহার পূর্ব্ব-স্থানে গিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া কেবলই হাসিতে লাগিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় অরুণের সমস্ত শরীর পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আনন্দোচ্ছ্বাস টাকে চাপিবার জন্যই সে আলোর নিকট রুমালটী মেলিয়া ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিকে তার ফুলকাটা, মধ্যে

এক প্রজাপতি এবং একপাশে "অরুণবাবু" লেখা। অরুণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ প্রজাপতিটা কেন?" সুধীর দিদি বলিল, "এম্‌নি ত আর সত্যিসত্যিই প্রজাপতি দয়া করলে না। সেই দুঃখেই ত বৌ একটা নকল প্রজাপতি এনে ঘাড়ে বসালে। দেখি, এইবার যদি দেবতা তুষ্ট হন।" ওদিকে যে আর একজন হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, তাহা দেখিতে পাইয়া অরুণ একটু বিরক্তভাবেই বলিল, "তা ওঁর সেজন্য অত মাথাব্যথা কেন?" পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু দিদি, এ যে আরও মুস্কিল হ'ল। একে এমনিই ভেবে অস্থির কল্‌কাতায় এবার থাক্‌ব কি করে', তার উপর যদি এই একটা স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গে থেকে জ্বালাতন করে, তা' হলে ত বেঁচে থাকাই দায় হবে দেখ্‌ছি। তাতে আর ওঁর কি বলুন; ওঁর ত আর কোন কষ্ট হবে না!" দিদি বলিল, "তা আর হবে না? কেমন গো বৌ, অরুণ চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?" নীলিমা ঘাড় এক পাশে বহুদূর হেলাইয়া জানাইল, "খুব হবে।" দিদি এবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা' না হয়ে যায় কোথায়,—ভালবাসার যে এম্‌নি জ্বালা!" দুই দিক হইতে কলহাসি ও চাপাহাসির তরঙ্গ উঠিতেই আরক্তমুখে অরুণ বাহির হইয়া গেল।

৩

কলিকাতায় আসিয়া অরুণ সুধীকে লিখিল, "কবে আস্‌ছ? কলেজ যে খুলে এল। শীগ্‌গির এস, বিশেষ দরকার।" কি যে বিশেষ দরকার, তাহা সে নিজেই জানিত না। তবু তাহার মনে হইল, সুধীর কাছে

বলিবার তাহার যেন একটা বিশেষ কি কথা আছে। এবার নকলের মধ্যে আসলের যে গন্ধটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর সে অস্বীকার করিতে পারিল না। সর্ব্বক্ষণ যে কথাটা কেবলই মনে জাগিয়া উঠে, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যে দিশেহারা বাসনা ফুলের স্পর্শে তাহার মনকে ছুঁইয়া যায়, তাহার যে বোধ করাইবার মত অস্তিত্ব আছে তাহা না মানিলে চলিবে কেন? সুধী আসিলে তাহার নিকট সে তাহার নূতন সুখের সংবাদটা দিতে গিয়া এক এক জায়গায় আপনি বাধিয়া গিয়াছে। সুধী যখন সরল হাস্যে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, আমি এবার বাড়ী না গিয়ে ত তা'হলে বড্ড বোকামীটা করেছি", তখন সে ঠিক তেমনই ভাবে জোর দিয়া তাহার সমর্থন করিতে পারিল না। অথচ কোন্ জায়গাটায় যে ঠিক বাধে, তাহারও সে কিনারা করিতে পারিল না। কিন্তু কেমন একটা উদাস ভাব, পড়াশুনায় মন লাগাইতে না পারা, ফুলের প্রতি একটু বিশেষ মমতা, গোলদীঘিতে একা একা বেড়ান—লক্ষণগুলি সে নিজেই মিলাইয়া প্রথমটা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। আর তার উপর যখন একটু জ্বালা, কেমন কিছু ভাল না লাগার ভাবটা স্পষ্টই সে অনুভব করিতে পারিল, তখন একটা মিথ্যার কাল পর্দ্দা যে তাহার অজ্ঞাতসারে কখন পড়িয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া সে নিজেরই উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল; একটা ঘৃণা বিষাক্ত উদ্গারের মত তাহার গলা পর্য্যন্ত যেন ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল।

কিন্তু মানুষ পরের কাছেও ছোট হইতে রাজী আছে, তবু নিজের কাছে নিজেকে তার যখনই খাটো মনে হয়, তখনই সে তাহার ধড়াচূড়া আঁটিয়া আয়নার কাছে আপনাকে বেশ মানাইয়া লয়, আর পরের কাছে

খাটোর অভিমান লইয়াই নিজেকে বড় করিয়া তুলিতে চায়। যেটাকে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল সেটা যখন ঠেলিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিল, তখন তাহার একটা 'গতি' করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। অতটা না ভাবিয়াই অরুণ ভাবিল, "বেশ, তাতেই বা ক্ষতি কি? এমন কি আর হয় না? আর যদি নাই হয়ে থাকে, তাতেই বা কি এসে যায়? আমি চাই principle, সেটাকে বজায় রেখে আমি আদাড়ে ভাগাড়ে যেখানেই পড়ে থাকি, আমি রাজা, আমি বড়, আমি মহান্।" উত্তেজনাটা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা সে সুধীকে ছাতে লইয়া গিয়া বসিল। একখানা মাদুরের উপর বসিয়া দুই বন্ধুতে অবান্তর অনেক কথা চলিল। অরুণ চিৎ হইয়া শুইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সুধী, ড্যামন্-পিথিয়াসের গল্প পড়েছি, এ পোড়া যুগে কি তেমন বন্ধুত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না?" অরুণ কথাটা হঠাৎই এমনভাবে বলিয়া ফেলিল যে, বলিয়াই সে অনেকটা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সুধী মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া বলিল, "কেন পাওয়া যাবে না? আমি ত ভাবি আমরাই বা তাদের চাইতে কম কিসে।" বলিয়া একটু হাসিল। অরুণ একটু কাসিয়া বলিল, "তা কম বই ত কি; আমরা কি তাদের মত বন্ধুর জন্য অতটা আত্মত্যাগ দেখাতে পারি?" সুধী একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "তা ঠিক, আমরা অতটা নিশ্চয়ই পারি না।" অরুণ বলিল, "আচ্ছা, কেনই বা পারি না? তারাও ছিল মানুষ, আমরাও মানুষ। তাদের মহত্ত্ব ছেড়ে আমরাই বা কেন সঙ্কীর্ণ হতে যাই? কেন যাই? সে কার দোষ? আমাদেরই নয় কি?" সুধী ধীরে ধীরে বলিল, "আমাদেরই বটে।

তবে আমরা সমাজের জীব, সমাজের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কিছু বদ্‌লে যাওয়াই স্বাভাবিক।" অরুণ জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, "স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু অন্যায় বটে। মানুষকে ঐটুকু শক্তি দেওয়া হয়েছে, সমাজের অন্ধ জড়তা ছাড়িয়ে সে উপরে তার সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই ধর না কেন, আমি যদি তোমাকে আমার জন্য অনেকটা ত্যাগ করতে বলি, তুমি বল্‌তে পার না যে তুমি তা' পার না, শুধু ক'রবে না। আজকালকার বাজারে স্বার্থের দর খুবই বেশী স্বীকার করি, কিন্তু বড় স্বার্থের জন্য ছোট স্বার্থকে যে ত্যাগ করা চলে, এতে ত আমি কোন ভুলই দেখ্‌তে পাই না। এ দেশেই না খুব ত্যাগের মন্ত্র শুনান হ'ত! খাঁটি লবণটুকু নিতে হলে লোণাজলের অনেকটাই ছাড়তে হয়। এটা আমরা বুঝি, কিন্তু কি ছাড়লে কোথায় নীচে পড়ে যাব, এ ভয়টাকে দমিয়ে রাখ্‌বার মত সাহসটুকুই শুধু আমাদের নেই। 'আমার কিছু নেই' বলে সটান বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার জোর সক্রেটিসেরই ছিল; আমরা তাই চোখ বুজে বলি, 'পারি না তা কি করবো, আমরা ত আর দেবতা নই'।" সুধী বলিল, "তা যখন ঠিকই পারি না, তখন আর কি করা যায়? আত্মত্যাগ করা ত মুখের কথা নয়, সকলেই পারে না। সে দোষটা কারও উপরে চাপান যায় না। কেন পারে না তা জিজ্ঞাসা করে' কোন ফল নেই। কোন কালেই বড় একটা পারত না, একালে একটুও পারে না। সকলেরই যেমন সচ্চরিত্র হওয়া উচিত কিন্তু পারে না, এও তেমনি একটা উচিত, শুধু পারা সহজ নয়।" কথাটায় অরুণ একটু বিরক্ত বোধ করিল, কিন্তু একটু হাসিয়াই বলিল, "তুমিও কি এ রকম একটা পারা-যায়-নার আশ্রয় খুঁজ্‌ছ নাকি?" সুধী

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কেন, আমাকে ত আর কেউ ত্যাগ করতে বলছে না।" "যদি বলে ?"—অরুণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সুধী ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "কেন, সম্ভাবনা আছে নাকি ? তা না হয় তখন দেখা যায় সেটা পারা-যায়-না না, পারা-যায়ের মধ্যে।" অরুণ উঠিয়া বসিল; সুধীর মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমি একটা জিনিষ চাই, দিতে পারবে ?"

"তোমার চাই না কি ? তবে দেখা যাক্।"

"সেটা দেওয়া তোমার পক্ষে তেমন বেশী না হওয়াই বোধ হয় উচিত, কিন্তু পেলে আমার পক্ষে এমন, যার বড় আর নেই।"

"কি বলই না।"

অরুণ একমুহূর্ত্তকাল ভাবিল, তারপর তার মাথাটা একটু নীচে ঝুঁকিয়া পড়িল, অস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হইল, "তোমার বৌ"।

সুধী একেবারে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি ?"

অরুণ তেমনই মাথা নীচু করিয়া ছিল বলিল, "সবটা নয়, অর্দ্ধেক।"

"কি রকম," বলিয়া সুধী আর একবার হাসিয়া উঠিল, কিন্তু পর-ক্ষণেই অরুণের দিকে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। অরুণের মুখে তখন একটা পাণ্ডুছায়া সুস্পষ্ট মলিন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চোখের কোণেও বোধ হয় একবিন্দু জল ছল্‌ছল্ করিতেছিল, কিন্তু সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

৪

সুধী নতমস্তকে ভাবিতে লাগিল। বিস্ময়ের প্রথম বেগ কাটিয়া না

যাওয়া পর্য্যন্ত তাহার বুকটা দুরু দুরু করিতেছিল। একি, এও কি সম্ভব! অরুণ কি তাহার সঙ্গে তামাসা করিতেছে না! এটা কি ছল নয়, পরীক্ষা নয়, অথবা কেবল একটা উদ্ভটরকমের ঠাট্টা নয়! যদি নাই হয়, যদি প্রকৃতই সে মনে প্রাণে এইরূপ একটা দাবী করিয়া বসে! অরুণ যাহাই চায় না কেন, তাহার পক্ষে দেওয়াটা তেমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু এ কিরকম চাওয়া, সে যে ইহার কোন অর্থই বুঝিল না! সে কি ইহা দিতে পারে? অরুণ চাহিলে তাহার যে কিছুই না দিবার নাই! সে চাওয়াটা যত বড়ই হউক, সে দিতে একটুও পরাঙ্মুখ না। সে দিবে, নিশ্চয়ই দিবে, কিন্তু কি দিবে? অরুণকে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, সে কি দিবে। শুধু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও সে কি দিবে! কিন্তু অরুণের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না।

দুইজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিতেছিল। মাথার উপরে দুই একটা ক্ষুদ্র তারকা ফুটিয়া উঠিয়া একটা অদ্ভুত ঘটনার এক সাক্ষীর মত নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। আধ জ্যোৎস্নার ক্লিষ্ট আভাটাকে বক্ষে চাপিয়া যে আঁধারটা নীচে ঝুঁকিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তাহার গুমোটে সুধীর বুকের ভিতরটা যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পাশের বহু পুরাতন বাড়ীটার ভাঙ্গা দেওয়ালের উপর বসিয়া একটা কাক নিতান্ত অনাবশ্যক জোরের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া কা কা করিতেছিল; তারই প্রতিধ্বনিটা উপরের অন্ধকার বায়ুস্তরে বাজিয়া যেন একটা অদৃশ্য নিশাচরের করুণ আর্ত্তনাদের মত শুনাইতেছিল। সুধীর গা হঠাৎ ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। সে তড়িৎবেগে অরুণের হাতটা টানিয়া লইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, "কি বল না,

ভাই”, বলিয়াই আবার পূর্ব্বের মত নীরব হইয়া গেল। সুধীর বুঝিতে বাকী ছিল না, অরুণের মনে তখন একটা ঝড় বহিতেছে।

সুধী আবার ভাবিতে লাগিল। সম্মুখে যে সমস্যাটার ছায়াপাত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আশঙ্কার আকার কল্পনা করিতে গিয়া বিস্তর সম্ভাবনার মধ্যেই পড়িয়া যাইতে হয়। সুধী অরুণের মুখে বাড়ীর ঘটনাগুলি যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে শুধু আমোদ উপভোগ করা ছাড়া অন্য যাহা পাইয়াছিল, সেটা যে অরুণকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিমল সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত বৃত্ত আঁকিয়া দিয়াছিল, তাহার গণ্ডীর মধ্যে বন্ধু-প্রেমের উপাসনা ছাড়া তার নিম্নস্তরের কিছুই কল্পনা করা চলে না। অরুণকে সে বিলক্ষণ চিনে। তেজদৃপ্ত মনটা তাহার সর্ব্বদাই যে খাঁটি সত্যের নীতি অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুল ও নির্ভীক, তাহা সে এত ভাল করিয়া জানিত যে, এমন একটা অশ্রুতপূর্ব্ব দাবীর মুখে পড়িয়াও সে অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিতেছিল। সে এমন কিছু নিশ্চয়ই চাহে নাই যাহা অসঙ্গত, অথবা যাহার পিছনে একটা সত্যের মূর্ত্তি জাগিয়া নাই। তারই মুখে ত এমন চাওয়া সম্ভব। এমনভাবে কে চাহিতে পারে, ‘আমি তোমার স্ত্রীকে চাই’। বিল্বমঙ্গল চাহিয়াছিল; তার পক্ষেই শুধু সম্ভব হইয়াছিল, কারণ, তার মধ্যে একটা সত্যের অনুসন্ধিৎসা চিরকালই তড়িতের মত স্পন্দিত ছিল। কিন্তু আসল কথাটা যা’, তাহার কোন কিনারা ত হইল না। তাহার কি দিবার আছে? সে কেমন করিয়া তাহার স্ত্রীর অর্দ্ধেক তাহাকে দিবে? সে যে পারিলে দিতে চায়ই, তাহাই ত যথেষ্ট নহে। দাবীর এ বস্তুটা কাল্পনিক মনে হইলেও যে অরুণের নিকট খুবই সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে

কে বুঝাইয়া দিবে——এ নূতনতর তথ্যটা কি! সে যাহাই হউক, তাহার অবমাননা সুধীর করিতে পারিবে না——এইটুকু জানাই আপাততঃ যথেষ্ট।

অরুণের আনত মস্তক তখন অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন বাগান হইতে ঝিল্লীরব আসিয়া পৌছিতেছিল। বাতাস থামিয়া যাওয়ায় সেই তেতালার ছাতেও সুধীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল। শুধু দূরস্থ গাড়ীর ক্ষণিকশ্রুত ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবীতে একটা মৃদু সাড়ার অনুভব বাঁচিয়াছিল, আর বিশ্বের চিরজাগরূক স্পন্দন কতগুলি মিট্‌মিটে তারার চাহনিতে দুলিতেছিল মাত্র। এই অস্বাভাবিক নীরবতার ভার ঠেলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়া সুধী মাথা তুলিতেই অরুণও মাথা তুলিয়া চাহিল।

অরুণ আবার ধীরে মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল পরে অনুচ্চস্বরে বলিল, "তুমি কি ভাব্‌ছ জানি না, কিন্তু তুমি যদি আমার ভিতরটা দেখ্‌তে পেতে, তা'হলে বোধ হয় এমন অবস্থায়ও তোমার সহানুভূতি ছাড়া অন্য ভাব আস্‌তে পার্‌ত না।"

কথাটা সুধীর কাণে এত করুণ ঠেকিল যে, সে অরুণের হাতটা জোর করিয়া এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে তাহার মাথা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার আমার সম্বন্ধ স্বার্থের নয়, নিতান্তই ত্যাগের। কিন্তু তুমি আমাকে এখনও ত ভাল করে' বলনি, তুমি কি চাও।"

অরুণ মাথাটা ঠেলিয়া আবার নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কি তা' শুন্‌তে পার্‌বে!"

সুধী অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করিয়া বলিল, "আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না। তোমার ব্যথার কতকটা আমায় না দিলে তোমার সমস্ত জ্বালাটাই আমায় সইতে হবে। শুধু দয়া করে' বল্ কেমন ক'রে আমার সর্ব্বস্ব তোকে দিতে পারি।"

আনন্দে অরুণের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, ছল্‌ছল্ চোখে দুই হাত দিয়া বন্ধুর গলা জড়াইয়া সে বলিল, "তুমি কেন না দেবে, তোমাকে দিতেই হবে।"

কয়েক মুহূর্ত্তকাল আবার দুইজনে নীরব হইয়া থাকিয়া অরুণ বলিল, "দেখ, সমাজের বন্ধন মানি, সেটা সাধারণের জন্য, সকলের জন্য। কিন্তু যেখানে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মানুষ মনুষ্যত্বের সমস্ত মহত্ত্ব নিয়ে হৃদয়ের ভরা জোয়ারে জনসাধারণ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তার ব্যক্তি-বিশেষত্বকে সজাগ করে' তোলে, সেখানেও কি তার বিচার সর্ব্বসাধারণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের দিক থেকেই হতে হবে, সেখানে কি শুধু তার জন্যেই তাকে বিচার করা চলে না? তার নিজের ব্যক্তিত্বের উপর ঘা দিয়ে তাকে পিসে জড় করে' ফেলা নিশ্চয়ই উচিত নয়। তার নিজের বিশেষত্ব-টুকুই তার প্রাণের স্পন্দন, সেটাকে চেপে তাকে মেরে ফেলা কখনই একটা মহৎ কাজ হতে পারে না। আমার হৃদয়ের আবেগ যেখানে দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছে, তখন আমাকে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে ফেলে তার নিয়মে বিচার করো না, আমার হৃদয় নিয়ে শুধু আমাকেই বিচার কর। সমাজের অন্ধ শাসনের মধ্যে তা' হলে আর আমার স্বাধীনতা কোথায়? কিন্তু যতক্ষণ সত্য আমার সহায় ততক্ষণ যে আমি স্বাধীন, সেটা ত আর সমাজের অনুমোদনের প্রতীক্ষা করে না।—কিন্তু তুমি বিরক্ত হোচ্ছ!"

"একটুও না, তুমি বল।"

"কিন্তু আমি তা' কেমন করে' বল্‌ব, তেমন কথা যে কেউ কাউকে বলে' নি। বল্‌তে সত্যিই খুব লজ্জা করে।"

"কেউ বলে নি বলেই ত তোমাকে বল্‌তে হবে।"

"তবে শোন। আমিও কি জান্‌তুম! তোমাকে ত বলেইছি, শুধু তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে না যাও তাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমাকেই পূর্ণভাবে আগেকার মত আমার করে রাখ্‌ব বলে' যে তৃতীয় ব্যক্তি এসে এক নিমেষে আমার চাইতেও তোমার বেশী আপনার হয়ে গেল, তাকে শুদ্ধ একটা সব-জোড়া স্নেহের মধ্যে ফেলে তোমাকে ধরে রাখ্‌ব, এই ছিল আমার চেষ্টা। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই খুব একটা অসম্ভব philosophyই হবে! তাই অতখানটা আগ্‌লাতে গিয়ে কোনদিকই বোধ হয় রাখ্‌তে পারি নি।" অরুণ নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল, "হ্যাঁ, পারিই নি, সেটা সত্যি। আমার তখন নিজের বিশেষত্ব জেগে উঠেছে, আমি আর তোমার হয়ে থাক্‌তে পারি নি।" আবার চুপ করিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যেন অনেকটা আপনাকেই বলিতে লাগিল, "মানুষের মনের গুপ্তকোণগুলিতে কখন্ কি লুকিয়ে থাকে, তা' বোধ হয় কেউ বল্‌তে পারে না।" তারপর সুধীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "আমার মনে আমার বাসনা মেতে উঠেছে। আমি তোমাকে ছেড়ে তাকেই ভালবেসেছি। কিন্তু এ বড় ভয়ানক আকর্ষণ, আমার সমস্ত মনপ্রাণ ছাপিয়ে উঠেছে। এত জ্বালা আমি আর সইতে পারি না। তুমি বোধ হয় বুঝ্‌বে না।" সুধী তাহার সহানুভূতির সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বলিল, "মনে কর, আমি খুব

বুঝ্‌তে পাচ্ছি—কারণ, আমাকে বুঝতেই হবে। কিন্তু কি করা যায় ভাই?" অরুণ নিরাশার একটু করুণ হাসি হাসিয়া বলিল, "এর আর কি করা যায়? কিন্তু যদি আমিও তাকে পেতাম, আমারও যদি তাকে বিয়ে করা সম্ভব হ'ত!" সুধীর বুকের ধুকধুকি মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল; অস্ফুট আর্ত্তনাদের সুরে বলিল, "কেমন করে'?" মাথার উপর দিয়া একটা পেচক বিকট চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। অরুণ উপরের দিকে চাহিয়া উদাসভাবে নিশাচর পাখীটার বৃথা অনুসন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া সুধীর পাংশু মুখের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করিল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুইহাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পরে সংবদ্ধ করিয়া ঈষৎকুঞ্চিত ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া সে ব্যাকুল প্রার্থনার মতই বলিয়া উঠিল, "কেন তা' হবে না? তা'তে কি আছে আমায় বলে দাও, যা অন্যায়—অমঙ্গল। সমাজের কথা এখানে তুলো না,—সমাজ এখানে মূক, কঠোর, জড়। সমাজের হৃদয় সাধারণের হৃদয়, সে আমার হৃদয় নয়। সমাজ কেন সেটাকে দোষ বলে, আমার জান্‌বার কোন দরকার নেই। তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে সেটা দোষ নাও হতে পারে। সেটা আপনা থেকেই এমন কিছু দুষ্ট নয়, এই আমার বিশ্বাস। ভাল-বাসার প্রাণ সমাজের নয়, সমাজ তাই তার কিছু বোঝে না। আমার নিজের যা চেষ্টা আছে, আমার নিজের যা উদ্যম আছে, তা'তে আমি পবিত্রতাকে রক্ষা করতে একাই যথেষ্ট শক্তিমান, এবং সেইটুকু হলেই সমাজের ধার ভোঁথা হয়ে যাবে। কেন তা হবে না? দ্রৌপদীর কি পাঁচজন স্বামী ছিল না? সেটা কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ? না, তা অসম্ভব? তুমি আমি কেন এক একটী বিয়ে করে' আলাদা হয়ে যাব! তোমার যা

তা' কি আমার নয়? তোমার টাকাকড়ি যদি আমার হতে পারে, তা' হলে তোমার স্ত্রীও কেন আমার হবে না? সেইটেই আরও বেশী হওয়া উচিত, কারণ, টাকা পয়সার সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ নেই,—সেটা মিথ্যা, তার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয়। আর যেটা সত্য, যেটা ধ্রুব, যার সঙ্গে যুগযুগের, জন্মজন্মের সম্বন্ধ, যার সঙ্গে প্রাণের আদানপ্রদান, সেটাকে একটা অবাস্তব বাধার আশঙ্কায় দূ'রে ঠেলে ফেলায় সত্যের অবমাননা করা হয় না? তুমি মেরি করেলির half-flame theory মান? আমি মানি; তাই আমি চাই,—তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তারই জোরে চাই—, নয় তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর যদি তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ মিথ্যা হয়, আর তা না হলে যদি সেটা সত্য হয়, তবে আমাকেও তার সঙ্গে মিল্‌তে দাও।"

অরুণ প্রায় এক নিশ্বাসেই বলিয়া ফেলিল। তাহার কপোল ও গণ্ডদেশ যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। ভৃত্য উপরে আসিয়া জানাইল, আহারের ডাক পড়িয়াছে। দুই তিনবার ডাকিয়া যখন উভয়েরই বাহ্যজ্ঞানের কোন লক্ষণ- বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল না, তখন গরম গরম লুচিও যে বাবুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে মনে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রকাশ্যে 'অধিক রাত্রি' প্রভৃতির অনুযোগ, আস্ফালন করিয়া চলিয়া গেল।

উভয়েই বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুধীর কাণে শুধু বাজিতেছিল, "আমাকেও তার সঙ্গে মিল্‌তে দাও!" এ এক নূতনতর সমস্যা বটে। অন্য কেহ হইলে সুধী নির্ব্বিকারভাবে চুপ করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু,

অরুণের হৃদয়ের যতখানি সুধী স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, সেখানে উত্তেজনা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, একটা মীমাংসার নিতান্তই দরকার। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, কি একটা দুঃসহ চিন্তা তাহার মুখে কালিমা লেপিয়া দিল। এ কি উত্তেজনা, এ যে তাহাকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছে! সহসা অরুণের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "অরুণ তোমার বাসনাকে তোমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বলে ভুল কর' না। আমি তোমার উদ্দাম বাসনার প্রশ্রয় দিতে রাজী নই। এখন এই উত্তেজনার মুখে সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কোন কথাই হতে পারে না। আমার বিশ্বাস, তুমি কি চাও, তা' তুমিই জান না।" অরুণ উত্তর করিল না, একবার কেবল সুধীর মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক নত করিল। তা ঠিক, সে কি চায় তা' সে নিজেই জানে না। তাহাকে তবে এখনও জানিতে হইবে সে কি চায়! বুকের অজানা দেশে যে কথাগুলি বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্থানে স্থানে জমিয়া উঠে, সেগুলি ত আর সত্যিকার ভাষা নয়! সুধীও চিন্তা করিতে লাগিল। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘে মেঘে মিলিয়া একটা জমাট মসীর চন্দ্রাতপ সৃজন করিতেছিল। সুধী বলিল, "তা ছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছ এর আসল বাধাটা কোথায়। এটা শুধু তোমার আমার মতেরই অপেক্ষা করে না। বেশী নির্ভর করে তার উপর, যার দু'জনের স্নেহের দায়ীত্ব মাথায় তুলে নিতে হবে। সে কি কখনও এতে রাজী হতে পারে? যে সমাজের ভয়ে তোমার আমার মত শিক্ষিত যুবক কেঁচোর মত গুটিয়ে যায়, তার রক্তচক্ষুর সামনে একজন স্ত্রীলোক, তায় নববধূ, তাকে দাঁড় করান নৃশংসতার কাজ হবে না কি? সেই বা কি সাহসে সমাজের শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজী হবে? তুমি

পুরুষ, তোমার আপনার একটা জোর আছে, তার যে তাও নেই।" সুধী একদৃষ্টে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু থামিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া আবার বলিল, "সমাজকেও আমরা ভুলে যেতে পারি না। হিন্দুসমাজ গাছই হোক্, পাথরই হোক্, সে বেঁচে আছে। আমি যেখানেই যেভাবে থাকি, আমায় লোকের সঙ্গে মিশ্‌তেই হবে, তখন যদি তা'রা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'এই লোকটার স্ত্রীর দুজন স্বামী', আমি কি তা' শুন্‌তে পারব, না, তারাই তা' জেনে আমার সঙ্গে সমান-ভাবে মিশ্‌তে চাইবে?" অরুণ নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল। সুধী পারে বটে, কিন্তু সে ইহার এমনভাবে বিচার করিতে জানে না। সুধী আবার বলিল, "আর একটা কথাও ভাব্‌বার আছে।—" হঠাৎ সে থামিয়া গেল। তাহার মনে হইল, অরুণের উপর সে যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছে। একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "তুমি আর বিয়ে করবে না?"

"না"।

অকস্মাৎ মসীলিপ্ত শূন্যের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ হানিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে কড়্ কড়্ শব্দে অদূরেই কোথায় বজ্র পড়িল।

৫

নিবারণের আর সহ্য হইল না। প্রায় দুইসপ্তাহ হইতে চলিল, তাহার নববিবাহিতা স্ত্রীর হস্তলিপি আসিয়া পৌঁছায় নাই। হা হুতাশ ও আর্ত্তনাদ করিয়া সে মেস্ মাথায় করিল। সমপাঠীদের নিকট এ সম্বন্ধে ঘন ঘন আপীল করিয়াও যখন কেবল হাসিতামাসা ও ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই লভ্য হইল না, তখন সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরাশার

শেষ আশা লইয়া সে নববধূকে লিখিয়া জানাইল, দুর্ম্মতি বালিকাকে জীবনে আর তাহার পত্রের আশা করিতে হইবে না।

ইহার ভিতরে একটু তথ্য ছিল। এ হতভাগাটা বিবাহ করিয়াই জাহান্নমে যাইতেছে দেখিয়া সতীশ প্রমুখাৎ মেসের ছাত্রদল অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল। সতীশ গর্জ্জিয়া উঠিল, "উনিই ত্রিসংসারে একা বিয়ে করেছিলেন! সাধে কি আমরা অধঃপাতে গেছি। যে জাতির বীরপুরুষদের একদিন স্ত্রীর চিঠি না পেলে একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যায়, সে জাতি আবার self-government চায়! দেশটা হ'ল কি?"—ইত্যাদি। দেশের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া সতীশ যতটা মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহার অনুগত নিবারণ-বিরোধীর দল ততটা হয় নাই। কিন্তু সতীশ যেদিন 'হতভাগা'-টাকে সুপথে আনিবার সঙ্কল্প করিয়া তাহার স্ত্রীর পত্রগুলি যাহাতে নিবারণের হাতে না পৌছায় তাহার যুক্তি আঁটিতে বসিল, সেদিন হরিশ গজেন প্রভৃতি সকলেই আগামী কৌতুকটার প্রলোভনে বিশেষ করিয়া নিবারণের বিপক্ষে যোগদান করিল।

বেচারা নিবারণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই। তাই যখন প্রথম চিঠির দিনটা ফাঁকা চলিয়া গেল, সেইদিন হইতেই সে তাহার দুঃখের কাহিনী সারা মেস্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জানাইতে লাগিল। প্রথমে সকলে সহানুভূতি প্রকাশ করিল, শীঘ্রই চিঠি পাওয়া যাইবে ইত্যাদি বলিয়া আশ্বাস দিল, তারপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের অস্ফুট গঞ্জনা যখন পরিষ্কার গালিগালাজে পরিণত হইল, তখন নিবারণ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল।

সেদিন বেড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া সতীশ দেখিল, নিবারণ

তাহার বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, আর তাহার পাশেই সুধী একখানা চেয়ারে বসিয়া বোধ হয় কিছু সান্ত্বনার কথাই বলিতেছিল। সতীশ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল, "আবার এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন ? তোমার ঐ বিরহের কাঁদুনী শোন্‌বার আমার একটুও অবসর নেই। আমার পড়াশুনা আছে, তা জান ত ?" বলিয়া সে তাহার ল্যাম্পটা জ্বালাইতে আরম্ভ করিল। বাতিটা জ্বালান হইয়া গেলে বলিল, "অল্পবয়সে বিয়ে দিলে এরকম দুর্গতিই হয়। ছেলে সবে কলেজে ঢুকেছে, এর মধ্যেই বে' দেওয়া। কেন বাপু, কলেজ থেকে বেরিয়ে এলে কি বে' দেওয়া যায় না ?"

সুধী একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যিই ত, কলেজে থাক্‌তে কি বিয়ে দিতে আছে! কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে কল্লেই ত বিয়ের যত আপদ সব চুকে যায়।"

সতীশ সবেমাত্র আর একটা চেয়ার টানিয়া টেবিলের নিকট বসিয়াছিল। সুধীর ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিয়া সবেগে লাফাইয়া উঠিল। আসল কথা, তর্কের গন্ধ পাইলে সতীশের আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। চীৎকার করিয়া বলিল, "আরে, তা কে বলে ? তবে পড়াশুনা হয়ে গেলে পর বিয়ে করলে আর এতটা দুর্দ্দশা হয় না। এই যে নিবারণটা এখানে লক্ষণের শক্তিশেল অভিনয় কচ্ছে, এবার কি আর ও ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করতে পারবে তুমি ভেবেছ ? এইখানেই ওর পড়াশুনা খতম। চিঠি পায় না তাইতেই এই, ও এবার পূজোয় বাড়ী গেলে কি আর ফিরে আস্‌তে পারবে ? এমন জোয়ান মদ্দ পুরুষ, ও কেন বৌর জন্য এমন নাকী কান্না কাঁদবে ? আমি এ সব দেখ্‌তে পারি

Be a hero in the strife,—এই ত একমাত্র নীতি হওয়া চাই।”

সতীশের উত্তেজিত স্বর শুনিয়া মেসের ছেলেরা সব একে একে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। কেহ সুধীর বিছানায় শুইয়া, কেহ টেবিলের উপর বসিয়া, কেহ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তর্কটার মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য মৃতপশুর চারিদিকে বুভুক্ষিত শ্যেনের মত অপেক্ষা করিতেছিল।

সুধী কথাটা শুনিয়াই যেন একটু চমকিয়া গেল। আর একজনকে এ কথাটা সেও প্রকারান্তরে বলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বলিয়া অবধিই তাহার মনে যে ধোঁকা লাগিয়াছিল, আজ তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে শুনিয়া গণ্ডগোলটা আরও বাড়িয়া গেল বই কমিল না। এ ‘hero’র অর্থই বা কি, আর এ ‘বীর’ হওয়ার তাৎপর্য্যই বা কি? কার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে? নিজের সঙ্গে? নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কে জিতিল, জানিবার কোন ঔৎসুক্যই হইতে পারে না। সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, “strife কোথায়? কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে? তোমার সঙ্গে নয় ত?” ছেলেরা হাসিয়া উঠিল। সতীশ বলিল, “বাঃ, এ ত বেশ কথা, কার সঙ্গে কি আবার! ও ওর এই স্ত্রৈণতাকে চেপে রাখ্‌তে পারে না?” সুধী জিজ্ঞাসা করিল, “লাভ?” সতীশ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, “লাভ! ও পড়্‌বে শুন্‌বে না? কোন কাজকর্ম্ম করবে না? শুধু ঘরে বসে বসে কাঁদবে?”

সুধী ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ও বিয়ে করবে না?” “তা, বিয়ে করে’ যদি এমন স্ত্রীলোক হ’তে হয়, তা’ হলে বে’ না করাই ভাল।”

সুধী হাসিয়া বলিল, "স্ত্রীলোক হওয়ার অর্থ কি ? কোমলহৃদয় হইয়া আর স্ত্রীলোক হওয়া যদি এক হয়, তবে এমন স্ত্রীলোক হতে আমি কোন আপত্তি দেখি না। জোর করে' শক্ত হওয়ার কোন মর্য্যাদা নেই। আমার আসল যে জিনিষগুলো আছে, তা' ঢেকে রেখে আমার সং সাজবার কোন দরকার নেই।" এই আসল জিনিষগুলির কথাই না অরুণ ব্যক্তিবিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

সতীশের কাছে এরকম যুক্তি যেন কেমন বেখাপ্পা ঠেকিল। তার মনুষ্যত্বের তীব্র ধারণাগুলিকে তাচ্ছল্য করিয়া এই যে সুধী এক আসল-নকলের দ্বন্দ্ব আনিয়া ফেলিল, এ তাহার আদৌ ভাল লাগিল না। মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "আমি তোমার এ ঘোরপ্যাচের কিছু বুঝি না। সোজা কথায় বুঝি, আমরা পুরুষ, আমাদের জীবনে কতগুলি কর্ত্তব্য আছে——যার 'বৌ' 'বৌ' করে' পাগল হ'লে বিশেষ ক্ষতি হ'তে পারে।" সুধী তাহার চিন্তার ঝোঁকেই বলিল, "আর যদি সে কর্ত্তব্য-গুলোর সঙ্গে হৃদয়ের বিরোধ বেধে উঠে, হৃদয়ের কর্ত্তব্য যদি সমাজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের সঙ্গে এক না হয় ? আমায় সব বল্‌তে পার, কিন্তু আমার হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে' তোমার কর্ত্তব্য আমায় পালন করতে বল্‌তে পার না। Passion is passion তোমার পুরুষত্বের passion থাক্‌তে পারে, আর ওর স্ত্রীলোকত্বের passion থাক্‌তে পারে না ? পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি ভিন্ন ? পুরুষ মানুষ, আর স্ত্রীলোক মানুষ নয় ? হৃদয়ের কাছে আবার পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি ?" হঠাৎ থামিয়া গিয়া সুধীর মনে হইল, ঠিক এই কথাটাই বোধ হয় অরুণের আসল কথা। নীলিমার সঙ্গে অরুণের মিলিবার কি বাধা থাকিতে পারে যদি তাহাদের

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে ? কে বলিল, অরুণ পুরুষ, আর নীলিমা স্ত্রীলোক ? সমাজ তা" বলে বটে, আর তারই প্রতিধ্বনি করিয়া সুধীও সেদিন তাই অরুণকে বলিয়াছিল। তার আবেগের ভাষায় সে যাহা নিজের করিয়া বলিয়াছিল, আজ সুধীর স্পষ্ট মনে হইল আবেগটুকু বাদ দিয়া দেখিলে সে কথা সকলের——মানুষমাত্রেরই। নিবারণ একটা সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিয়া নিজের স্ত্রী বলিয়া যাহাকে আখ্যা দিয়া বিচ্ছেদের কষ্ট সকলকে জানাইতে লজ্জাবোধ করে নাই, অরুণ আজ তাহার সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছে বলিয়াই না সমাজের প্রতিনিধি হইয়া সে তাহার রক্তচক্ষু তুলিয়া, তাহাকে ধম্‌কাইয়া দিয়াছে! একদিন উপবাস করিয়া দু'টা মন্ত্র আওড়াইয়াছে বলিয়াই কি নীলিমা তার একটা আইনতঃ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে নাকি ? প্রচলিত 'legal wife' কথাটা মনে পড়ায় সুধীর হাসি পাইল। তারও ত এমনি একটা legal wife যুটিয়াছে। নিবারণেরও যুটিয়াছে, তাই আজ এত তিরস্কারের মধ্যেও তার সান্ত্বনা,— সে সমাজের বাহিরে যায় নাই, শুধু বোধ হয় পুরুষত্বের বাহিরে গিয়া থাকিবে!

সতীশ বুঝিল, এ লোকটার সঙ্গে সহজবোধ্য ভাষায় তর্ক করা চলিবে না। তাই তাহারও এই রকম একটা বায়বীয় কথা বলিবার দরকার হইয়া পড়িল ; তাহা না হইলে তর্কে বোধ হয় তাহাকে নিরস্ত হইতে হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে মনে বহু তর্জ্জমা করিয়া একরকম চক্ষু বুজিয়াই সে বলিয়া ফেলিল, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে, কেবল দু'টো হৃদয়ে মিল হ'লেই——সে পুরুষে পুরুষেই হোক্, আর পুরুষে স্ত্রীলোকেই হোক্,——সামাজিক বা নৈতিক নিয়মগুলির বিরুদ্ধে একটা

স্বেচ্ছাচারী শক্তি হয়ে পড়া যায় ?” বলিয়াই তাহার মনে হইল, নিজের প্রশ্নটার অর্থ ভাল না বুঝিয়াই সে বলিয়া ফেলিয়াছে, এইবার যাহা উত্তর শুনিবে তাহার বিন্দুবিসর্গও সে বুঝিতে পারিবে না ; তাহার বুকের ভিতরের কম্পটা সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল।

সুধী চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “হ্যাঁ, তুমি যখন ঐ ভাবেই কথাটা বল্‌ছ, তখন তাই ধ'রে নাও। এই মনে কর, যদি আমি আর নিবারণের বৌ পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালবাসি, তা'হলে আমারও তাকে বিয়ে করতে কি দোষ থাকৃতে পারে ?”

সতীশ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল,—ভাষাটা তবে নিতান্ত অভিধানের বাহিরে যায় নাই! একদিকে সতীশের এই আশ্বস্তি ও অন্যদিকে সুধীর উত্তর জানিবার উৎসুক অপেক্ষার মধ্যে শ্রোতার দল একবারে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া উভয়দিকের গুরুভারটাকেই মুহূর্ত্তের জন্য লাঘব করিয়া দিল। বিজন গিয়া নিবারণের বুক চাপড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “তা মন্দ নয়, নিবারণের বৌর বিয়েতে আবার একটা নিমন্ত্রণের আশা আছে। আমি তোমার হয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করে দিই, কি বল নিবারণ ?”

নিবারণের কিন্তু তর্কটা হঠাৎ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না, শুধু কৃপাপ্রার্থীর দীনদৃষ্টি তুলিয়া সে সুধীর মুখের দিকে অনুযোগভরে চাহিয়া রহিল।

সুধী ঠিক হাসিতে পারিল না, অথবা যে হাসিটা নিতান্ত না হইলেই নয়, সেটা ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়াই এমন কালো হইয়া গেল যে তাহাতেই সমস্ত মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। একটা

জিনিষ তবে সুধীর এখনও জানিবার বাকী আছে, তার পূর্ব্বে সমস্যার কোন রকম পূরণই হইতে পারে না। সে নিজেই না এইমাত্র বলিল, যদি উভয় উভয়কে ভালবাসে? কিন্তু নীলিমা অরুণকে ঠিক ততটা ভালবাসে কি না, তাহা ত এখনও তার জানা নাই। অরুণও ত সে সম্বন্ধে কিছু বলে নাই; সে শুধু তার নিজের ভালবাসাটাই জানাইয়াছে। নীলিমাও কি অরুণকে ভালবাসে?—প্রশ্নটা মনে করিয়াই সুধী দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল। যে খোঁচাটা এবার নিশ্চিতই তাহাকে কোথায়ও বিঁধিল, সে অনেক ওজর জানাইয়া গেল। একটি একটি করিয়া তার প্রত্যেকটিকে নাম দিতে হইবে। এ ত আর কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনা নয়, যাহা শুনিয়াছে তাহাকে মর্ম্মের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া পরখ করিয়া দেখা!

৬

পূজার ছুটিতে সুধী ও অরুণ দুজনেই বাড়ী আসিল। সেই রাত্রির পর হইতে উভয়ের এ সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই, বাড়িতে আসিয়াও হইল না। অরুণ প্রথম ভাবিয়াছিল, বাড়ী আসিবে না। শুনিয়া সুধী চোখে মুখে এমন তীব্র তিরস্কার মাখাইয়া তাহার দিকে ভ্রূকুটি করিয়াছিল যে, অগত্যা অরুণ একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া সম্মত হইল।

সুধী প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল যে, অরুণের একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। সে সম্বন্ধে যে আর কোন কথা হয় নাই, তার জন্য সুধী স্থির করিল, অরুণই দায়ী। এবং সেজন্য তার কিছু আশঙ্কাও ছিল। এটা যে ধীরে ধীরে পাথরের মতই তাহার বুকে

চাপিতেছিল, তাহা অরুণের নির্ব্বাক ধৈর্য্য দেখিয়া সুধী গোড়া হইতেই সন্দেহ করিয়াছিল। কিন্তু বেশী করিয়া যেটা সুধীকে বেদনা দিতেছিল, তাহা অরুণের সঙ্কোচভাব। অরুণের সেই দৃপ্ত তেজ সেদিন হইতে আর তাহার মুখে খেলিতে দেখা যায় নাই। সুধীর মনে হইল সে যেন লজ্জায় চোরের মতই একটা অন্ধকার আবরণ খুঁজিতেছিল। এমন পরিবর্ত্তন সহ্য করিবার মত দৃঢ়তা সুধীর ছিল না। তাহার পূর্ব্বেকার কথা স্মরণ হইল। সেই রাত্রির সেই সমাজ বিদ্রোহী অরুণ, তারপর হঠাৎ কোথায় একটা অজানা আঘাত পড়িল; হয়ত বুঝি তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, যাহার নিকট সমাজের বিরুদ্ধে নিশানা তুলিয়া তাহাকে আহ্বান করা হইতেছিল, তাহারই হৃদয়ের উপর সে সেই নিশানা শক্ত করিয়া গাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। সত্যই ত, অরুণের যদি এই চিন্তা মনে আসিয়া থাকে! অরুণের অনুতাপ কল্পনা করিয়া সুধী উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে তাহার উত্তেজনা আরও বাড়িয়া গেল সত্য, কিন্তু বুকের প্রতি ধুকধুকিতে যে একটা সূঁচের মত কি বিঁধিত, তাহার জ্বালা হইতে চিন্তাই বেশী অসহনীয় হইয়া উঠিল। সে নিজে একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছে না? পরীক্ষার চিন্তায় অবসাদের ভিতরেও তাহার বুকটা স্ফীত হইয়া উঠিল। অরুণ সত্য চায়, তাহাকে সত্যই দিতে হইবে তাহার মনে হইল, অরুণ যেন ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বলিতেছে, 'এ দেশেই না খুব ত্যাগের মন্ত্র শেখান হয়!' সে আর তাহা বলিবে না!

অরুণ বাড়ী আসিয়া কেন যে দুইদিন পর্য্যন্ত সুধীদের বাড়ী যাইতে পারিল না, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজের কাছেও স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলে

নাই। কিন্তু তারপর যখন একদিন হীরেন্দ্র প্রমুখাৎ সংবাদ আসিল, "আপনি আমাদের বাড়ী যান না, বৌদি' খুব দুঃখু কচ্ছে, বলে, এখন আর আপনার তা'কে মনে নেই", তখন আবার একটা পুরাতন পুলকের মধ্যে ঢোঁক গিলিয়া, যাইবার জন্য না উঠিয়া সে থাকিতে পারিল না।

সুধী আসিয়াই একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সন্দেহকে বেশীক্ষণ পুষিয়া রাখা তাহার কোনকালেই অভ্যাস ছিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে নীলিমাকে চিনে বলিয়াই ইহাতে ইতঃস্ততঃ করিবার কিছু নাই। আর সে ইহাতে স্বীকৃত হইবে না কেন? তাহার স্বামী ত আর তাহাকে একটা অপকর্ম্ম করিতে উপদেশ দিবে না। সে নিশ্চয়ই জানে, অরুণ তাহার কত আপনার! না জানিলেও তাহাকে জানাইতে হইবে, সুধীর এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহা অরুণেরও নয়। আরও জানাইতে হইবে, অরুণ যে ভাবে এ মিলন মাগিয়াছে তাহা শুধু তারই পক্ষে সম্ভব। সে কত বড়, তাহার আদর্শ কত উচ্চ, তাহার স্নেহ কি গভীর এবং পবিত্র সবই তাহাকে জানাইতে হইবে। অরুণের ভালবাসা পাইলে কেহ আপনাকে কৃতার্থ মনে করে না, ইহা তাহার কল্পনার অতীত। নীলিমার যে ইহা কত বড় সৌভাগ্য তাহা সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে। তাহার বক্তৃতার চুম্বকটাকে মনে মনে বহুবার আওড়াইবার পর একদিন সে কথাটা পাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সে দিন রাত্রে অরুণকে ভাবনার মধ্যে ফেলিয়া সুধী দৃঢ়পদে যখন অরুণের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পাড়া তখন একবারে নিঝুম। সুধী তাহাদের পশ্চিমের ঘরে ঢুকিতেই নীলিমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। সম্মুখে প্রদীপ রাখিয়া

মেজেতে বসিয়া সে কি একটা বুনিতেছিল। সুধী সরাসর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তারপর, ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া কথাটা তোলা যায়। মধ্যে মধ্যে আনমনাভাবে সে এক একবার অদূরে সঞ্চালনপটু অঙ্গুলি-গুলির প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল। একটু থামিয়া ডাকিল, "নীলিমা"। নীলিমা এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া আবার বুনিতে লাগিল। সুধী বলিল, "তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা কথা আছে, একবার উঠে এখানে আস্‌বে?" নীলিমা আস্তে আস্তে তাহার বুনানী রাখিয়া সুধীর পায়ের দিকে খাটের উপর আসিয়া নত মস্তকে বসিল। সুধী একেবারে আচম্‌কা কথাটা পাড়িল; একটু বিশেষ গম্ভীর হইয়া বলিল, "অরুণ বল্‌ছে সেও তোমাকে বিয়ে করবে,"—বলিয়াই নীলিমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিল, কিন্তু মাথার কাপড়টা এমন ভাবে বেড়িয়াছিল যে মুখখানা ভাল দেখা গেল না। নীলিমা যেমন বসিয়াছিল তেমনি রহিল। উভয়েই মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিবার পর সুধী বলিল, "কি, উত্তর দাও না যে?"

"এর কোন জায়গাটা প্রশ্ন যে উত্তর দেবো?"

"তুমি রাজি আছ কি না?"

এবার নীলিমা হাসিতে হাসিতে একেবারে বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল। সুধী অপ্রস্তুত না হইয়া অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া বলিল, "হাস্‌ছ যে?" নীলিমা হাসিতে হাসিতেই উত্তর করিল, বলিল, "বেশ ত, কেন রাজি থাক্‌ব না; তুমি যদি রাজী হও তা'হলে আর আমার আপত্তি কি?"—বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল। সুধীর এবার অত্যন্ত রাগ হইল, ভৎ'সনার সুরে বলিল, "তুমি কি ভেবেছ, এটা একটা ঠাট্টা? এটা হেসে উড়াবার কথা নয়। আমি আমার জীবনে কখনও এর

চাইতে গম্ভীর হয়ে কথা বলিনি।" নীলিমা হাসি থামাইয়া নীরবে বস্ত্রাঞ্চল বামহস্তের তর্জ্জনীতে পাকাইতে লাগিল। সুধী বলিল, "অরুণ তোমাকে কতটা ভালবাসে, এবং সে ভালবাসা তার কাছে কত বড় জিনিষ, তা' জান্‌লে, তুমি এমন করে' হেসে উড়িয়ে দিতে পারতে না। আমরা কি তেমন ভালবাস্‌তে জানি। ভালবাস্‌তে পারাও একটা শক্তি, সে শক্তি সকলের নেই।" নীলিমা মাথা তুলিয়া বাধা দিয়া কহিল, "কি মাথামুণ্ডু বল্‌ছ তার ঠিক নেই। আমার এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে, ঘুমাই।" সুধী ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "ছিঃ নীলিমা, তুমি এমন ছেলে-মানুষী কর্‌তে পার! আমি কথাটাকে যত গম্ভীর হয়ে বল্‌তে চাই, তুমি তত ঠাট্টা করে' উড়িয়ে দাও! এটা শুধু অরুণের কথা নয়, এটা আমারও কথা,—এর উপর আমার নিজের সুখশান্তিও অনেকটা নির্ভর কর্‌ছে।" নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুধী বলিতে লাগিল, "অরুণ কেন তোমায় এত ভালবাসে, তা' এখন না বল্‌লেও চল্‌বে। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তা'হলে জেনো তার চেয়ে মহৎ আদর্শের উপর কোনদিন ভালবাসার ভক্তি স্থাপিত হয় নি। তুমি যদি আমাকে আমার স্নেহের জন্য ভালবাস্‌তে পার, তা'হলে তোমার তা'কে আরও বেশী ভালবাসা উচিত। আর তা' ছাড়া আমার এমন কিছু থাক্‌তে পারে না,—সে যাই হোক্‌,—যাতে অরুণের কোন ভাগ নেই। তোমার আমার যতটা নিকট সম্বন্ধ; তার চেয়ে তার আমার সম্বন্ধ যে দূর নয়, তা তুমি নিশ্চয়ই জান। আমি তোমার জন্য তার কাছ থেকে পৃথক্‌ হতে পার্‌ব না। আমার সুখের জন্য তুমি যতটা দরকারী, সে তার চেয়ে কম দরকারী নয়। যদি আমার আনন্দ তোমার কামনা হয়, তা'হলে

আমরা তিন জনে যা'তে এক হয়ে থাক্‌তে পারি, তা' তোমার কর্‌তেই হবে।" নীলিমা তবু চুপ করিয়া রহিল। সুধী মুহূর্ত্তকাল থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "তুমি হয়ত ভাব্‌ছ, এ কি করে' সম্ভব হয়,—একজন স্ত্রীলোকের একসঙ্গে দুজন স্বামী কি করে' হতে পারে। কিন্তু তুমি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী; তোমার এটা বোঝা উচিত, যা' সাধারণে না চলে এবং ভাল না দেখায়, এমন কাজ শুধু সত্যের জন্য মহত্মারাই কর্‌তে পারে। আর এ বিয়েতে তোমার কোন অসুবিধা নেই। সমাজ জান্‌তে পার্‌বে না। তুমি শুধু আমার কাছে তাকে স্বামী বলে গ্রহণ কর্‌বে। সে চিরদিন তোমাকে আপনার ভেবে ভালবাস্‌তে চায়। এটা আর কিছু অন্যায় নয়, বরং এত পবিত্র, এত উচ্চ, যে তামার মনে করতেও খুব আনন্দ হয়। তুমি রাজী আছ?"

নীলিমা ধীর অথচ সুস্পষ্টস্বরে বলিল, "না"।

সুধী একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বসিল, একটু তীব্রস্বরে বলিল, "কেন না?"

"আমি এ পিণ্ডি-ব্যবস্থার কোন অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"তুমি তবে অরুণকে ভালবাস না?"

প্রশ্ন শুনিয়া নীলিমা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; হাসিয়া বলিল "এ রকম?—না।"

"তবে কি রকম?"

"তোমার বন্ধু ভাল লোক, আর আমাকে খুব স্নেহ করেন, তাই।"

সুধী আবার শুইয়া পড়িল। তাহার দীর্ঘশ্বাসটা নিরাশার না আশ্বস্তির তাহা তলাইয়া দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

৭

সারারাত্রির অনিদ্রাজনিত অবসাদ লইয়া অরুণ ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া জানিতে পারে নাই, কখন সুধী আসিয়া তাহার পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। জানালার ভিতর দিয়া যখন উষার সোনালী আভাটা ঢুকিয়া ধীরে ধীরে সতেজ হইয়া উঠিতেছিল, তখন অরুণ ধড়মড় করিয়া উঠিতেই পার্শ্বে শয়ান সুধীর উপর দৃষ্টি পড়িল। তাহার পাণ্ডুর ক্লিষ্ট মুখে বেদনাজনিত একটা বিকৃতি সেই ঘুমঘোরেও যে তাহার তীব্র আঘাতের পরিচয় দিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া অরুণের বুঝিতে বাকী রহিল না, গতরাত্রে যে নিষ্পত্তিটা হইয়া গিয়াছে,তাহাতে তাহার আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহাকে দুর্ব্বল ও একা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। মর্ম্মাহতের ভাঙ্গা বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সে উঠিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সুধী পাশ ফিরিয়া চক্ষু মেলিল। অরুণের দিকে তাহার রাঙ্গা চক্ষু ফিরিতেই একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে "ওঃ!" বলিয়াই সে আবার মুখ ফিরাইয়া অন্যপাশে শুইয়া পড়িল। অরুণ অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "সুধী"; তারপর তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তা'তে কি হয়েছে ভাই!"

কিন্তু গত রাত্রের ঘটনাটা অরুণের জানা ছিল না। সুধীর ক্লেশের কারণটা তাই সে ঠিক ধরিতে পারে নাই। যেটা তাহাকে বেশী বেদনা দিতেছিল তাহা নীলিমার প্রত্যাখ্যান নহে,—অরুণের চরিত্রের উপর নীলিমা যে সুস্পষ্ট সন্দেহের ছায়ালাভ করিয়াছে, তাহাই। অরুণের কথারই আবৃত্তি করিয়া সুধী যখন বলিয়াছিল, এ বিবাহ ছাড়া অরুণের

মনে শান্তি আনিবার অন্য উপায় নাই, তখন নীলিমা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, "ভারী আব্দারে কথা ত। বড় পৌরুষের কথা, না? পরস্ত্রীকে আপনার স্ত্রী বলে' না ভাব্‌লে তাঁর প্রাণরক্ষার উপায় নেই। তিনি এতদূর দুর্ব্বলচিত্ত, আমি তা' কোনদিন ভাব্‌তেই পারি নি। তাঁর ভিতর যখন দুর্দ্দমনীয় লোভ ঢুকেছিল তখন তাঁর উচিত ছিল, সে পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপায় খোঁজা নয়, বরং তাকে সংযত করা—সে প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে' যুদ্ধ করা। সেটা হ'ত পুরুষের মত কাজ। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, তিনি তোমার কাছে তাঁর এত বড় দুর্ব্বলতার কথাটা বল্‌তে একটুও লজ্জা বোধ করেন নি,—তাঁর মনুষ্যত্বের গৌরব তাঁকে কুণ্ঠা এনে দেয় নি! যে এমন কথাটা পেড়ে তার প্রশ্রয়ের জন্য বড় বড় মুখস্থ-করা কথা বল্‌তে পারে, তাকে কি করে' সম্মানের চোখে দেখা যায়, আমি ভেবে পাই না। সমাজের সংযমের বাঁধাবাঁধির উপর নিজের স্বেচ্ছাচারের ধ্বজা তুলে' সমাজ-সংস্কারের গর্ব্ব করা নিশ্চয়ই বড় কাজ নয়। মহৎপ্রাণ, উদার হৃদয় এ সব ত জানি তাঁরই, যিনি এই সমাজের বন্ধনকেও আপনার করে নিতে পারেন। থাক্, অত কথা আমি বল্‌তে পারি না। কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমি এ ফার্স করতে পারব না।" তারপর একটু থামিয়া গিয়া নরম সুরে বলিয়াছিল, "আমার বিশ্বাস, তাঁর এ ক্ষণিক দুর্ব্বলতা; তুমি বুঝিয়ে বল্লেই তিনি তাঁর ভুল বুঝ্‌তে পারবেন।"

সুধী সেই যে নীরব হইয়া গিয়াছিল, তার পর এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই। অরুণের চরিত্রে দুর্ব্বলতা আরোপ করা যে অন্ততঃ তাহার পক্ষে বড় সহজ নয়, সেটা সে যেমন ভাল করিয়া জানিত, তেমনি আবার

নীলিমার মুখে এই যে একটা নূতনতর যুক্তির মত শুনাইল, তার কাছেও সে নিজেকে একটু একটু করিয়া পরাভূত না মানিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। এ যেন একটা অন্যদিকে 'উচিত' দেখাইয়া দিল। সে অরুণের যেটুকুকে বড় বলিয়া এমন সসম্ভ্রমে মানিয়া আসিয়াছে, নীলিমার কাছে ঠিক সেইটাই এত সহজে ছোট হইয়া গেল দেখিয়া সুধীর নিজের বিচারের উপর আর কোন আস্থা রহিল না। তথাপি নীলিমা যে অরুণের একটা নিতান্তই বিসদৃশ ছবি তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে, সেটাকে সে বিনা যুক্তিতেই মানিয়া লইয়াছিল। তাই অরুণের এত আন্তরিক প্রয়াসটার ব্যর্থতা অরুণেরই মুখে এমনভাবে শোনায় তাহার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব যে তাহার পক্ষে বেশী রকম প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই মনে করিয়া আজ তাহার বালকের মত কাঁদিতে ইচ্ছা হইল।

অরুণকে সে সব বলিল; কিন্তু আজ এই প্রথম সে কিছু গোপন না করিয়া পারিল না। তিক্তটুকু যতটা সম্ভব বাদ দিয়া শুধু প্রত্যাখ্যানটার কথাই বলিল। কিন্তু অরুণের মুখে অপমানের লজ্জার আধ-কালো আধ-রক্তিম ছায়াটাকে ঘনাইতে দেখিয়া একটু জোর দিয়াই বলিল, "তা আমার বিশ্বাস, আমি ঠিক গুছিয়ে কথাটা বলতে পারি নি,—একটু সইয়ে সইয়ে বলা উচিত ছিল। শত হ'লেও ত স্ত্রীলোক, বোধ হয় একটু ভয় পেয়ে গেছে। তুমি যদি বলতে পারতে, তা'হলে বোধ হয় কাজ হ'ত। তুমি একবার বল্‌বে?"

অরুণ বলিল, "না"।

৮

সেইদিনই সুধী বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। তখনও শারদীয়া পূজা আরম্ভ হয় নাই। ঐ সপ্তমীটাকে আশ্রয় করিয়া যে আনন্দের আসর জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা একদিকে যেমন সুধীর পক্ষে অসহ্য মনে হইল, অন্যদিকে আবার তাহার আত্মীয় পরিজনের নিকট একটা দুর্দ্দান্ত কারণ হইয়া দাঁড়াইল—সুধীর না যাওয়ার পক্ষে। বেশী কিছু ছলছুতা না করিয়া সুধী কেবল বলিল, "বাড়ীতে আমার মন টি'কছে না; একবার রংপুর গিয়ে বেড়িয়ে আসা যাক্।" অরুণ বাড়ীতে, অথচ বাড়ীতে মন টি'কিতেছে না—ইহা যে হইতেই পারে না, তাহা জানিয়াও সুধীর ভাব দেখিয়া কেহ আর বেশী পীড়াপীড়ি করিতে সাহস করিল না। নীলিমা যখন কথাটা শুনিল, তখন তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। নিজের প্রগল্‌ভতায় যে সে আপনিই নিতান্ত নির্বোধের মত তাহাদের তিনজনের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে তাহার নিজের উপরই অত্যন্ত রাগ হইল। কেমন করিয়া সে কেবলমাত্র একটা কথার উপর নির্ভর করিয়া এমন সমালোচনা করিয়াছে তাহার, যাহাকে সকলেই আদর্শচরিত্র বলিয়া জানে। আর তাহার স্বামীর কথাটাকে এমন পাণ্ডিত্যের গর্ব্বভরে উড়াইয়া দিয়া সে যে কেবল তাহার নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়াছে, তাহাও তাহার পক্ষে কম লজ্জার কারণ নয়। স্ত্রীলোকের মুখে কি অমন কথা শোভা পায়? সে যে শুধু আদর করিয়া অযাচিত স্নেহ বিলাইয়া দোষকে গুণ করিয়া তুলিবে! তার কি চোখ রাঙান সাজে!

যাইবার সময় যে সুধী আশ্বাসের সুরে বলিয়াছিল, "আমি সহজে ছাড়ব না, নীলিমার এটা নিতান্তই বুঝ্‌বার ভুল", সেটা কেবল গায়ের জোরের কথা বলিয়াই একেবারে নির্বীর্য্য। তাই অরুণ তাহাতে শুধু অস্বস্তিই বোধ করিল। এ রায়ের উপর যে আর আপীল চলে না, ইহাকে লইয়া যে আর নাড়াচাড়া করা চলে না, সেটা সুধী তাহার উত্তেজনার মধ্যে না বুঝিতে পারিলেও, অরুণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রথমটা কষ্টের অপেক্ষা তাহার লজ্জাই অধিক বাজিল। নীলিমার চক্ষে সে নিশ্চয়ই কত খাটো হইয়া গিয়াছে! তার লজ্জা কল্পনা করিয়া অরুণের লজ্জা আরও বাড়িয়া গেল। সে যেন সর্পের মত উদ্দতফণা হইয়া তাহাকে অক্রমণ করিয়াছিল। সুধীর স্বাভাবিক সরলতার পিছনে আত্মরক্ষা করিয়া সে যে এই শরসন্ধান করিয়াছিল, ইহা একেবারেই কাপুরুষোচিত বলিয়া নীলিমার মনে হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে কেমন করিয়া আর মুখ দেখাইবে! তাহার মনে হইল, অধিবাসের ঢাক, ঢোল ছাপাইয়া তাহার নিরানন্দ মনে অপরাধটা চীৎকার করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিল তাহাকেই।

অধিবাসের দিন সন্ধ্যার পর অরুণ নিজের ঘরের অন্ধকারে চুপটী করিয়া বসিয়া বাহিরের চিরোন্মাদী আনন্দের সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিয়া এইবার যে প্রকৃতই বিচ্ছেদ ঘটিল—সেই ভাবনায় কেমন একটু অবসন্ন বোধ করিতেছিল, এমন সময় প্রভা একটা লণ্ঠন লইয়া আসিয়া একেবারে হঠাৎ তাহার মুখের কাছে আলোটা ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বেশ যা'হোক, আমি খুঁজে খুঁজে মরছি, আর উনি এখানে অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছেন। ওদিকে বৌদি' ত একেবারে পাগল, বলে, তাঁর ভালবাসাটা ত————"। "যাঃ", বলিয়া অরুণ

এমনই একটা চীৎকার করিয়া উঠিল যে, প্রভা লণ্ঠনটা টেবিলের উপর রাখিয়া হতভম্বের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অরুণ তাহার চুলের গোছাটা ধরিয়া একটা টান দিয়া শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিল, "কি লো পোড়ার যুথী?"—বলিয়াই তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। প্রভা আদর পাইয়া ভারী গম্ভীর হইয়া পড়িল। এমন দুঃখেও অরুণের হাসি পাইল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি বল্‌চিস্ বল্ না"। প্রভা ঠোঁটদুখানি ফুলাইয়া নাকি সুরের ভান করিয়া বলিল, "আমি আর পারব না, বাপু। ওদিকে বৌদি জ্বালাতন করে, শুধু বলে, 'ডেকে নিয়ে আয়', 'ডেকে নিয়ে আয়', আবার এদিকে ডাক্‌তে এলে উনি ধম্‌কাবেন। আমি বাপু আর তোমাদের ঝিগিরি করতে পারব না। কে কোথায় ছট্‌ফট্ করে' মরে, তা' দেখে আমার দরকার কি?" অরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া চিন্তিত মনে বলিল, "চল্, যাচ্ছি।"

সুধীদের বাড়ী যাইতেই সুধীর দিদি যে সম্ভাষণটা করিল, তাহার উত্তর দিতে গিয়া অরুণ অনেকটা থতমত খাইয়া গেল। এবার আর স্বাধীন ভাবে আসা নয়, এবার যেন জজের এজলাসে প্রহরী বেষ্টিত কয়েদীর আসা। যে বিচারের সম্মুখীন হইতে সে আসিয়াছে, তাহার ফল এত নিশ্চিত যে, অরুণ শুধু দণ্ডতারই প্রতীক্ষা করিয়া নীরবে দক্ষিণের ঘরে বসিয়া জমাখরচের খাতাটার পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বারান্দায় রিণিঝিণি করিয়া অলঙ্কারের শিঞ্জিনী বাজিয়া উঠিতেই অরুণের বুকের ভিতরে একেবারে উত্তাল সমুদ্রের মতই এমন একটা কোলাহল বাজিয়া উঠিল যে, তাহা সামলাইতে গিয়া নীলিমা যখন আসিয়া মাটিতে মাথা

ছোঁয়াইয়া প্রণাম করিল, তখন আর সে বাধা দিতে পারিল না। প্রভা বুঝাইয়া বলিল, "পূজোর সময় গুরুজনকে প্রণাম এবং আপনার জনকে উপহার দিতে হয়, তাই বৌদি' প্রণাম কর্ল্লে, এইবার হাত পাত, নৈলে তুমি ত উপহার নিবে না।" অরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়াইল। নীলিমা ধীরে ধীরে আসিয়া ভাঁজ করা একখানা কার্পেট তাহার হাতের উপর ফেলিয়া দিল; তারপর দরজার কাছে সরিয়া গিয়া প্রভার কাণে কাণে কি বলিল। প্রভা বলিল, "বৌদি বল্‌ছে, তুমি আর এদিক পানে আস না, তুমি তাকে ভুলে গেছ।" হঠাৎ তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া নীলিমা দরজা আর দেওয়ালের মাঝে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল। প্রভা সংশোধন করিয়া বলিল, "না, না, তুমি আমাদের ভুলে গেছ", বলিয়া সেও কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিতে লাগিল।

অরুণ কার্পেটখানাকে খুলিয়া ধরিল। সুচিত্রিত কার্পেটের উপর কাল উলসুতার লেখা রহিয়াছে,

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে'
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে,
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অরুণ যখন সুধীদের বাড়ী হইতে আসিয়া আবার তাহার অন্ধকার ঘরে ভাবিতে বসিল, তখন তাহার মনে শুধু একটা নির্ম্মল আনন্দ খেলিতেছিল,—বিচারে দণ্ডটা যে অসম্ভবরকম লঘু হইয়া গিয়াছে, সে কথাটা তখন সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

৯

সুধীর চিঠি পাইয়া অরুণ অত্যন্ত ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেল। এক-দিনেই তিনখানা চিঠি আসিল। সুধী তাহার দিদিকে লিখিয়াছিল, "আমার শাশুড়ীর বড্ড অসুখ। তোমাদের বউকে এখানে আনিবার জন্য বলিতেছেন। অরুণেরও ত বন্ধ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহার সঙ্গেই তাহাকে পাঠাইবে।" নীলিমা ও অরুণের নিকট যে চিঠি আসিয়া-ছিল, তাহাতেও ঐ একই কথা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অরুণ যখন স্থির করিল—প্রকৃতই ইহাতে লজ্জা করিবার কিছুই নাই, তখন তাহাকে নূতন ভাবনায় ধরিল, নীলিমা সব জানিয়া শুনিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী হইবে কেন? কিন্তু যখন সুধীর দিদি তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, সে না লইয়া গেলে নীলিমার এখন আর যাওয়া হয় না, আর নীলিমাও দেখা হইলে বলিল, "ওঁর ত আর আমাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য মাথা-ব্যথা হয় নি, মাথাব্যথা যত সব ত আমারই," তখন সমস্ত চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া বাক্স, পেটারা বাঁধিয়া একটা ভাল দিন দেখিয়া সে একেবারে নৌকায় চড়িয়া বসিল। এদিকে সমবয়সীদের সঙ্গে নীলিমা একখানা সবুজ সাড়ী পরিয়া ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রভা যেই করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বৌদি'র এবার ভারী ফূর্ত্তি, অরুণদা'র সঙ্গে যাচ্ছে কি না", অমনি একটা মৃদু ঠোনা দিয়া নীলিমা তাহার কাঁধে মুখ লুকাইল। ওদিকে যে আর একটি বুক অলক্ষে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, তাহার সাক্ষী শুধু অন্তর্যামীকেই রাখিয়া নীলিমা নৌকায় উঠিয়া ভিতরে বিছানার উপর গিয়া বসিল। অরুণ নৌকার মাথায় গিয়া মাথার উপর ছাতি মেলিয়া বসিয়াছিল। নৌকা খালের বাঁকটা ঘুরিতেই নীলিমা ঘোমটাটা

একটু ছোট করিয়া দিয়া ইঙ্গিতে অরুণকে বিছানার একপাশ দেখাইয়া নিজে শয্যার অন্যপাশে গিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

যে অপরাধের শাস্তিবিধান না করিয়া করুণা অথবা স্নেহের ওজরে ক্ষমা করা হয়, সেটা অপরাধীকে চিরকালের জন্য দাগী করিয়া যায়, তাহার বোঝাটা নাবিক সিন্দ্‌বাদের স্কন্ধারূঢ় অবিবেচক বৃদ্ধটার মতই দয়ামায়া-শূণ্য হইয়া কাঁধে চাপিয়া বসে, কিছুতেই যেন ফেলিয়া দেওয়া যায় না। শুধু ক্ষমা করাই নয়; তাহাকে যে সাদর আহ্বানে নিকটে টানিয়া আনা হইতেছে, সেটা যে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাওয়ারই একটা সাঙ্কেতিক অনুরোধ, তাহা শুধু নবজাগ্রত আনন্দের উদ্দীপনাতেই অরুণ অস্পষ্ট বুঝিতে পারিল মাত্র। কিন্তু এই আপনার করিবার চেষ্টার মধ্যেই যে স্বাতন্ত্র্যের ভাবটা, আপনি জাগিয়া বসিয়া আছে, সে ব্যবধানটা অনুভব করিতে সে সহজেই পারিল। তবু এ দূরত্বটাকে যে তাহার অতিক্রম করিতেই হইবে! দূর সে কোনকালেই ছিল না; আজ সন্দিগ্ধ স্নেহের দোলনের মধ্যেও সে জোর দিয়া আপনার মনকে বলিল,—কোনকালে থাকিবে ও না।

রৌদ্রের তেজটা প্রখর হইতেই নীলিমা আর একবার ইঙ্গিতে তাহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিল। অরুণ বলিল, "আপনি একটু ঘুমোন্, রাত্রে ত আর ঘুম হবে না।" নীলীমা মাথা নাড়িল, শয্যাপ্রান্ত দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল, "আপনি ঘুমোন্" অরুণ আবার বলিল, "আমাদের রাত জেগে পড়া মুখস্থ করা অভ্যাস্ আছে। আপনার কিন্তু ঘুমোন উচিত, নৈলে শেষটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন"। নীলিমা আবার মাথা নাড়িল এবং পুনর্ব্বার তাহার

অনুরোধ জানাইল। মাঝি গোড়া হইতেই সব লক্ষ্য করিয়া উত্তরোত্তর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িতেছিল। সে অন্দাজ করিয়াছিল, ইহারা স্বামী-স্ত্রী হইবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে 'আপনি' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে, অথবা স্ত্রীকে স্বামীর সম্মুখে ঘোমটা দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিতে সে তাহার এই পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের মধ্যে আর কোনদিন দেখে নাই। তাই সে পরিপক্ক বয়সের অহঙ্কার লইয়া এই যুবক যুবতীর ক্রীড়া দেখিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে লাগিল।

নৌকা যখন জেটির অদূরে বালির চরে আসিয়া ঠেকিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। জেটির লণ্ঠনগুলি মৃদুমন্দ দুলিতে দুলিতে স্তিমিত আলো বিকীর্ণ করিতেছিল। ধূ ধূ দূরে নদীর ওপারের অস্পষ্ট রেখাটা অসীমের একটা নিতান্ত সসীম আভাষ দিতেছিল। পদ্মা ও খালের মোহানায় একখানা নৌকা একটা উদ্দেশ্যহীন জীবনের মতই মন্থরগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। নৌকার মাথায় বসিয়া তার নবীন আরোহীটি কম্পিতস্বরে গাহিতেছিল,—

"মাঝি, তরী হেথা বাঁধ্‌বনাকো আজ্‌কে সাঁঝে।
ভিড়ায়োনাকো চলুক তরী নদীর মাঝে।
এই নদীরই এই ঘাটেতে
এম্‌নি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীটিকে
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথ্‌লে উঠি'
বক্ষে তাহার পড়্‌ত লুটি'
পথে প্রিয়া আমায় দেখে'

ঘোম্‌টা দিত হর্ষে—লাজে।
তরী হেথা বাঁধ্‌বনাকো আজ্‌কে সাঁঝে।"

মধ্যপথে একটা জলমগ্ন চরে ঠেকিয়া গিয়াছিল বলিয়া সেদিন ষ্টীমার গোয়ালন্দ পৌঁছিতে অনেক দেরী করিয়া ফেলিল, ট্রেণ ধরিতে পারিল না। কাজে কাজেই সে রাত্রিটা সেখানে থাকিয়া পরদিন বেলা একটার গাড়ীতে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অরুণ নীলিমাকে লইয়া ষ্টেশনের অদূরেই একটা হোটেলে গিয়া উঠিল। সেখানে শুনিল মোটে একটি ঘর ভাড়া পাওয়া যাইবে। "তথাস্তু," বলিয়া সেই ঘরে মোট রাখিয়া পার্শ্বেই খাটের উপর নীলিমাকে বিছানা করিতে বলিয়া সে আহারের বিশেষ উদ্যোগ করিতে বাহির হইয়া গেল। হোটেলওয়ালার অনুগ্রহ যে কঙ্কর-কণ্টকিত মোটা ভাত এবং পদ্মার অনুকরণে ডাল, আর বড় জোর একটা রসশূন্য পোড়ামাছের ঝোল ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে না, তাহা অরুণের বিলক্ষণ জানা ছিল। কাজেই তাহাকে দধি-দুগ্ধের অন্বেষণে বাহির হইতে হইল। আহারাদি সমাপ্ত হইতে বারটা বাজিয়া গেল। অরুণ বলিল, "এইবার আপনি ঘুমোন্। আমি সতরঞ্চটা নিয়ে বাইরে যাই, বাইরে ঘুমোব অখন।" বাহির বলিয়া সে যে দিকটা অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিল, সেটা মাটির উঠান। নীলিমা সজোরে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, অরুণ বিছানায় শুইবে, আর সে মেজেতে সতরঞ্চ পাতিয়া শুইবে। ইচ্ছাটা প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সতরঞ্চ পাতিয়া একটা ছোট বালিশ শিয়রের দিকে রাখিয়া বসিয়া পড়িল। অরুণ সলজ্জ-কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার বাইরেই শোওয়া উচিত। আর তাতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। একটা রাত্রি এপাশ ওপাশ করে'ও ত কাটিয়ে দেওয়া

যায়।" নীলিমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, "যায়," তার পর ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। অরুণ বলিল, "তা'হলে আমি যাই, বাইরেই শুইগে।" নীলিমা মাথা নাড়িল, "না," আবার একটু হাসিল। অরুণ বলিল, "আপনি বুঝ্ছেন না—"। নীলিমা বাধা দিয়া আবার মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না"। একটু হাসিয়া অরুণ বলিল, "তবে আপনি বিছানায় এসে ঘুমোন্, আমি সতরঞ্চের উপর শুই।" শুনিয়া নীলিমা এত হাসিতে লাগিল যে, অগত্যা অরুণ পা ঝাড়িয়া বিছানায় উঠিয়া সটান চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণের নিদ্রা আসিল না। নিদ্রার উপযুক্ত নিশ্চিন্ত মন তাহার তখন ছিল না। কেবল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। নীলিমা দেখিতে পাইয়া প্রজ্জ্বলিত আলোটাকে ক্ষীণ করিয়া দিয়া তাহার স্থানে ফিরিয়া গিয়া বসিল। কিন্তু যাহার মনে শান্তি নাই, তাহাকে বাহিরের চিকিৎসায় ঘুম পাড়ান চলে না। অরুণ শুইয়া ভাবিতে লাগিল, সুধী একটা সুযোগ দিয়াছে বই ত নয়,—বাহির হইতে দেখিতে গেলে ইহাই ত স্বর্ণ-সুযোগ বটে! কিন্তু নীলিমা এখন তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এ সুযোগ পাইয়া মন কষাকষি করাটা একদিকে যেমন অসঙ্গত, অন্যদিকে তেমনই কাপুরুষতা। না, এদিকে চিন্তাস্রোত বহিলে তাহার শান্তি মিলিবে না। তাহাকে ইহার একটা কূল' করিতেই হইবে। কিন্তু নিজের পক্ষে বলিবার তাহার যে কিছুই নাই। সে কি শুধু বলিবে, 'তুমি আমার সব চেয়ে বেশী আপনার, এ না ভেবে আমি বাঁচ্তে পারি না; তাই তোমাকেও তা' স্বীকার করতে হবে'? ইহা ছাড়া ত অন্য কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বড় বড় নীতির দোহাই ত শেষে।

সর্ব্বপ্রথম যে কথাটা বলা উচিত এবং বলিতে হইবে, তাহা যে নিতান্তই স্বার্থের। কিন্তু এই স্বার্থটাই যখন প্রবল, ইহা ছাড়া যখন অন্য কোন 'অর্থ'ই তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন এই স্বার্থের মধ্যেই সকল 'অর্থ' নিহিত রহিয়াছে; সেইজন্যই ইহার প্ররোচনা মানিয়া লইতে হইবে। শ্যামকে পাইতে হইলে যে কূল ছাড়িতে হইবে, সে ত গোড়ার কথা। তাহা লইয়া আর এখন বিচার করা একান্তই নিষ্ফল।

ঘরের পিছনে যে ফলমূল-তরকারীর বাগানটা ছিল, এবং তারও পিছনে যে বিস্তৃত একটা খোলা মাঠ পড়িয়াছিল, খোলা জানালা দিয়া সেখান হইতে একটা ধীর, স্নিগ্ধ হাওয়া পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নার আলো মাখিয়া ঘরের মধ্যে বহিতেছিল সত্য, কিন্তু তথাপি অরুণ ঘামাইয়া উঠিতে লাগিল। সে একেবারে গায়ের কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। নিজের অজ্ঞাতে তাহার চক্ষু দুইটি ঘরের অন্য প্রান্তে কাহার অনুসন্ধান করিয়া এক নিমিষের মধ্যেই ঘুরিয়া আসিল। নীলিমাকে তখনও জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বালিশের উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখিয়া যেভাবে শুভ্র, সুগোল হাত দুইখানি ঊর্দ্ধে উঠিয়া দুই করে একখানা মুখকে তুলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে বুঝি বিদ্যাপতির বর্ণনাটা নিতান্তই মনে পড়িয়া যায়—"কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী-হীন হিমধামা"। নীলিমা উপুড় হইয়া শুইয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল,—বোধ হয়, দূরে প্রান্তরের উপর প্রকৃতির যে হাসিটা শত-মুখী নির্ঝরের ন্যায় নামিয়া আসিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং আরও দূরে ঐ মাঠটার ওপারেই নারিকেল গাছগুলির নীচে যে তরল আঁধারটা আশ্রয় নিয়া ছিল, তাহারই বুক চিরিয়া যে

জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি খেলিতেছিল, তাহাই একান্ত মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেছিল। অরুণ উঠিয়া বসিতেই সেও তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া উঠিয়া বসিল। ভিতরের চিন্তাগুলি বোধ হয় তাহার এই চঞ্চল, অশ্রান্ত ভাবের মধ্যে এবং মুখেও প্রকট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এইরূপ একটা আশঙ্কা মনে জাগিতেই অরুণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আঃ, আপনি যে এখনও ঘুমোন্‌ নি, কখন্‌ ঘুমোবেন?" নীলিমা বাহিরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল,—এমন রাত্রে প্রকৃতির এই উন্মদ বিলাসের মধ্যে কেহ ঘুমাইয়া থাকিতে পারে! অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ঘুম পাচ্ছে না?" নীলিমা জোরে মাথা নাড়িয়া বুঝাইল, "আদৌ না।" দুই জনের অবস্থা যে আশ্চর্য্য রকমেরই একটা তুলনার জিনিষ, এই চিন্তায় অরুণের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্যুতের মত একেবারে অন্যরকমের একটা চিন্তা তাহার মনে খেলিয়া গিয়া তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল।

অরুণ বলিল, "আমারও ত ঘুম পাচ্ছে না, তবে অবশ্য ও জন্যে নয়।" নীলিমা মুচ্‌কিয়া হাসিল। হাসির অর্থটা ঠিক বোঝা গেল না। মুহূর্ত্ত-কাল ভাবিয়া অরুণ আবার বলিল, "আচ্ছা, দুজনেরই যখন ঘুম আস্‌ছে না, তখন আলাপ করে' খানিকটা সময় কাটান যায় না?" তাহার বুকটা অত্যন্ত ধুক্‌ ধুক্‌ করিতেছিল বলিয়াই যে হাসিটার সহিত এ কথাটা বলা সেও নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছিল, সেটাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নীলিমা কিন্তু ঘোমটার মধ্যে হাত দিয়া মুখ চাপিয়া হাসিতে হাসিতে মাথা একপাশে হেলাইয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিল। অরুণ এবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনাকে যদি কখনও

ডাকবার দরকার হয়, তা' হলে কি বলে' ডাকব ?" নীলিমা অঙ্গুলিসঙ্কেতে নিজেকে দেখাইয়া দিল। অরুণ বলিল, "নাম ধরে' ?" মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া সে জানাইল "হ্যাঁ"।

"কিন্তু নাম ধরে' ডাকলে ত আর 'আপনি' বলা চলে না।"

"না।"

"তবে কি বল্‌ব,—তুমি ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন থেকে তা'হলে নাম ধরে' আর তুমি বলে ডাক্‌ব ?"

"হ্যাঁ।"

"এক পর্ব্ব হইয়া গেল। একটু থামিয়া যেন একটু দম লইয়া অরুণ বলিল, আচ্ছা আমরা তুজনে রাতে এই এক ঘরে আছি বলে' তোমার লজ্জা করে না ?"

নীলিমা হাসিল, জানাইল, "না"।

অরুণ চমকিয়া উঠিল। তুর্ব্বলের প্রশান্ত নির্ভরতার শক্তি লইয়া সে তাহাকে উপহাস করিল না ত ? হঠাৎ তাহার মনে হইল, সুধী বলিয়াছিল, "আমি ঠিক গুছিয়ে বল্‌তে জানি না, তুমি বল্‌বে ?" সে গুছাইয়া বলিতে জানে কি না, তাই এমন করিয়া আস্তে আস্তে নীলিমাকে আসল কথাটার দিকে টানিয়া লইতেছে ! ছি, ছি, এ ত রীতিমত শঠতা ! সে কি নীলিমার সঙ্গে চাতুরীর খেলা খেলিতে বসিয়াছে ! কথাটা ভাবিতেই একটা আবেগের তরঙ্গে তাহার সমস্ত বুকটা ভরিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা একটু কাঁপিয়াও উঠিল। বাহিরের উচ্ছলিত জ্যোৎস্নার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে একবার চাহিয়া মৃদু অথচ ধীর, সুস্পষ্ট স্বরে সে বলিল,

"দেখ নীলিমা, আজ এমন রাত্রে এমন সঙ্গে থেকে' আমার কি কথাটা কেবলই মনে হয়, তা' তুমি জান। কি সেটা আমায় বল্‌বে?" নীলিমা মাথাটা উপরে ঠেলিয়া দিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন তুমি জান না?" নীলিমা মাথা নাড়িল, "না"। অরুণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, সুধী তোমায় বলেনি?" নীলিমার মুখ ঘোমটার নীচে আকর্ণ রাঙা হইয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। অরুণ বুঝিল, যখন এতটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, তখন আর পিছাইবার উপায় নাই। এখন এই পরীক্ষাটার ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে। বালিশটাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সে বলিল, "আমি জানি, তুমি তা'তে রাজী হও নি। আমি জানতাম, আমার আশাটা খুব বড়, আরও বেশী করে' জানতাম, আমার ভাগ্যটা চিরদিনই পোড়া। তবু বুকের ভিতর যখন হু হু করে, তখন না বলে' কি করে' থাক্‌তে পারতাম, আমায় বলে দাও।" একটু থামিয়া আবার বলিল, "কেন তোমায় আমায় মিল্‌তে পারব না? তুমি আমায় স্নেহ কর, সে ত আমি এমন ভাল করে' জানি যে, তুমি আমায় প্রকাশ্যভাবে ঘৃণা না করলে আমার আশা কিছুতেই নিভ্‌তে পারে না। সুধী আর আমি ত কোনদিনই ভিন্ন ছিলাম না; আজ তুমি এসে মাঝে দাঁড়িয়েছ বলেও ত ভিন্ন হব না, কারণ, আমরা যেমন এক, তা' যদি তুমিও জোর করে' ভাঙ্গতে চাও, তবু পারবে না। সুধীর তুমি একলা হতে পারবে না। তুমি যদি স্বার্থান্ধ না হয়ে থাক, তা'হলে তোমার উচিত, সরে' গিয়ে আমাদের দুজনকে আগেকার মত আমাদেরই রাখ। কেন তুমি এমনভাবে আমাদের সুখশান্তি, আমাদের ভালবাসায় বাধা দিতে এসেছ।

আমার চেয়ে তার উপর কেন তোমার দাবী বেশী বল্‌তে চাও? তুমি যেন একটা ঝড়, নও কি?” নীলিমা নিশ্চল পাথরের মত শুনিতেছিল, তাহার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। অরুণ আবার একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, “কিন্তু বড় আনন্দের ঝড়! কোত্থেকে তুমি এলে, আনন্দের ঝড় বেয়ে এলে! যাদের তুমি ভালবাস, তারা সকলেই আনন্দে ডুবে গেল;—আর আমি? আমাকে কেন তুমি ভালবাস্‌বে না? আমি তোমাকে এত ভালবাসি, আর তুমি বাস্‌বে না? কেন?” অরুণের স্বর আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। আরও কিছুক্ষণ থামিয়া সে যখন আবার বলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার স্বর কাঁপিতেছিল, “আমি তোমাকে পার্থিব কোন দাবী রেখে চাই না। তোমার সঙ্গে আমার এ পৃথিবীতে কোন সম্পর্ক থাক্‌তেই পারে না। তোমাকে আমি তাই ত ভালবাসি, আর শুধু ভালই বাসি। আর সেইজন্যই আমার একটা খুব বড় বিশ্বাস, তোমার আমার মধ্যে ভালবাসার একটা সনাতন বন্ধন আছে, যা তুমি ইচ্ছা করলেও ছিড়তে পার না। তা' না হলে তোমাকে কেন এত ভালবাসি! তুমি জন্ম-জন্মান্তর ধরে' যেখানে যেভাবে থাক্‌বে, আমিও বোধ হয় তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌ব।” নীলিমা নড়িয়া উঠিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তেমনই ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়া মাথার কাপড় টানিয়া ঘোমটাটা ছোট করিয়া দিল, তারপর দুই হাতে জানালার দুইটা শিক ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না আসিয়া একেবারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে স্বর্ণচ্ছটা তাহার দোদুল্যমান নোলকে চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল, আর তাহার সবুজ সাড়ীতে নীলিমা

মাথাইয়া তার সূক্ষ্ম জরীর পাড়টায় কতগুলি বিদ্যুৎবিন্দু জ্বালাইয়া দিল। অরুণ এতক্ষণ একটু বিস্মিত, একটু মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল। নীলিমা জানালার কাছে দাঁড়াইতেই সে তাহার নিজের সাড়াটা অনুভব করিতে পাইয়া তেমনই করুণ, স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমি ভাল করে' জানি, তুমি আমাকে রূক্ষ্ম সমাজের দিক থেকে বিচার করবে না, কারণ, তোমার একটা অতি বড় স্নেহের হৃদয় আছে যা' সমাজের থাক্‌তে পারে না। তুমি শুধু স্নেহপাত্রী নও, তুমি স্নেহদাত্রীও। আর সমাজের এতে হাত দিবারই কি আছে? যেখানে দু'টি হৃদয় কেবল পরস্পর পরস্পরের প্রীতিতে আলিঙ্গন-বদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে আর সমাজ কি করে গিয়ে তার শাসনদণ্ড তুলে ধরবে? সেখানে শুধু তুমি আর আমি—ঠিক আমরা যেমন তেমনই। আমি কি তোমার কাছে উপেক্ষার জিনিষ হতে পারি? আমি তোমাকে আমার ভালবাসার আকর্ষণে গণ্ডীবদ্ধ করে' রাখব, যেখানে তুমি স্নেহমন্ত্রে স্পন্দিত হয়ে উঠবে। তুমি তখন কেমন করে' সাড়া না দিয়ে থাকবে?" অরুণের চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল, সে হঠাৎ থামিয়া গেল। নীলিমা একবার চঞ্চলপদে তাহার শয্যার কাছে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিল; তারপর আবার তেমনই চঞ্চলপদে বাতায়নের কাছে ফিরিয়া গিয়া জানালার ঈষতুচ্চ ভিত্তিটার উপর এক পা রাখিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্তটা তাহার অজ্ঞাতসারেই উত্থিত উরুর উপর সে রাখিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বামহস্তের চাঁপার মত আঙ্গুলগুলি দক্ষিণ-হস্তের চুড়ির নীচে মণিবন্ধটা ঈষৎ ক্ষিপ্রগতিতে চাপিয়া ধরিল। তাহার দুইটি হাতই যে একটু একটু কাঁপিতেছিল, তাহা জ্যোৎস্নার আলোকে অরুণ লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। বাতাস

তখন তেমনই বহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার অনুভূতি জাগাইবার শক্তি ছিল না, কেবল একটা অজ্ঞাত শিহরণ আনিয়া দিল মাত্র। বহুদূরে, সেই যেখানে নারিকেল গাছগুলি নীরবে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নাধারায় ভিজিতেছিল, সেখানে কি একটা পাখী যেন একটা করুণ সুরে বিনাইতেছিল, তাহারই ক্ষীণ লয়টুকু হাওয়ায় কাঁপিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল মাত্র। অরুণের তখন বাহ্যজ্ঞান বোধ হয় একেবারেই ছিল না; সে কেবল অস্পষ্টভাবে বুঝিল, তাহার প্রাণের জোয়ারে তখন বান ডাকিয়া উঠিয়াছে!

হোটেলের দরজার কাছে একজন কর্তব্যপরায়ণ কনেষ্টবল হাঁকিয়া গেল—"ভেইয়া হো," আর অমনি নিকটে ও দূরে শৃগালের রীতি অনুকরণ করিয়া এক সঙ্গে কতগুলি স্বর সপ্তমে ভাজিয়া উঠিল, "ভেইয়া হো" প্রহরীদের নৈশ ভজনের প্রতিধ্বনি সেই সর্ব্বগ্রাসী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর্দ্রস্বর কাঁপাইয়া অরুণ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "তুমি ঐখানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে স্থিরভাবে এ সব শুন্‌ছ? আশ্চর্য্য তুমি এমন! তোমাকেও আমি বলতে পারব না? কিন্তু তবু আমায় বল্‌তে দাও! তোমার আমায় ভালবেসে দরকার নেই, তোমার আমায় স্বামী ভেবে দরকার নেই—," নীলিমাকে দুই হাত দিয়া কাণ ঢাকিতে দেখিয়া সে আরও ব্যাকুল হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রার্থনাটা দয়া করে শোন। আমাকে তোমার আমার একান্ত আপনার ভেবে আড়াল থেকে তোমায় প্রাণ খুলে ভালবাস্‌তে দাও; নৈলে—"। তাহার জানাইবার সবটা আর বলা হইল না। নালিমা মৃদুস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ওঃ—"; ক্ষিপ্রহস্তে ঘোমটাটা মাথা হইতে ফেলিয়া দিয়া সে উন্মাদের মত ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

১০

ভোরের প্রথম কাকটা পাশের চালাঘরের উপর হইতে কা করিয়া উঠিতেই নীলিমার চৈতন্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, তাহাকে উঠানে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে কেহ না দেখিতে পায়, ইহাই তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। উঠিয়া গা না ঝাড়িয়াই সে আবার ঘরে ঢুকিয়া দরজা দিল, তারপর বালিশের নীচে মুখ গুঁজিয়া তাহার সতরঞ্চের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। অরুণ তাহা জানিতে পারে নাই। সারারাত্রি ধরিয়া যে মর্ম্মদাহ তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত প্রতি শিরায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহার জ্বালায় প্রথমটা ছটুফটু করিয়া সে একেবারে অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল। তখন সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যেটুকু সে বুঝিতে পারিতেছিল, সে কেবল তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে আগুনের শিখা যে সাঁ সাঁ করিয়া মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাই। প্রভাতের শীতল হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শে তাহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আনিলে সে একবার মাথা তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই অদূরে দান শয্যাটার উপর দৃষ্টি পড়িল। নীলিমার মাথায় তখন কাপড় ছিল না। শিথিল কবরীর উপর সোণার চিরুণীটা দেওয়ালের গায়ে যে ল্যাম্পটা তখনও জ্বলিতেছিল তাহার আলো পাইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল; শুভ্র বোডিস যেখানে গলাটাকে বেড়িয়াছিল তাহারই ঠিক উপরে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা যাইতেছিল; আর বিস্রস্ত কেশের কয়েকটা স্থানচ্যুত অলকের মধ্য দিয়া গণ্ডদেশের যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা তখনও হিন্দোল আভা ধারিয়া রাখিয়াছিল। অরুণ মুহূর্ত্তকাল সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। "উঃ",

বলিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে মুখ ফিরাইল; পরক্ষণেই বালিশটাকে বক্ষে চাপিয়া সে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল।

হোটেলের ঝি আসিয়া দরজায় প্রথম যে ধাকাটা দিয়াছিল, তাহাতেই অর্দ্ধজাগ্রত নীলিমা উঠিয়া বসিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তখন দরজা খুলিয়া দিল না। তাহার চোখ যে ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং তখনও যেভাবে তাহার বুকের ভিতরটা ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল, সে অবস্থায় সে তাহাকে প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। সহসা তাহার স্মরণ হইল, তাহার একারই শুধু বিপর্য্যয় হইবার কথা নয়, বজ্রটা যে আর এক স্থানেও পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সে মাথা তুলিয়া খাটের দিকে চাহিল। অরুণের মাথাটা খাট হইতে যেভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার সন্দেহ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার কপালে হাত দিতেই নীলিমা চমকিয়া উঠিল। জ্বরটা যে খুব বেশীই হইয়াছে তাহা বুঝিয়া তাহার অত্যন্ত ভয় হইল।

দাসী আসিয়া আবার একবার দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তখনও বন্ধ দেখিয়া সে এবার আর চুপ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। পূর্ব্বদিনের বামুনঠাকুরের 'চাকরাণী' গালিটা স্মরণ করিয়া একটু কর্ত্তৃত্বের সুরে বলিল, "বলি হ্যাঁগা, রোদ্ উঠ্‌ল যে, কি খাবার-দাবারের যোগাড় করতে হবে বলে' দিতে হবে না? মেয়েছেলে ছেলেমানুষের অত কেন ঘুম হবে? আমরা কি আর কোনকালে ছেলেমানুষ ছিনু না,—না, আমাদের অত ঘুম ছিল? হ্যাঃ,"—বলিয়া নথটা একটু ঘুরাইল। তারপর পরিপুষ্ট দেহটাকে একটু ঝাঁকাইয়া নূতন উদ্যমে কি যেন আরও

বলিতে গিয়া একেবারে থমকিয়া স্থির হইয়া গেল। নীলিমা আসিয়া তখন দরজাটা খুলিয়া দিয়াছে। তাহার চোখমুখের দিকে তাকাইয়া ঝি একেবারে অবাক হইয়া গেল, বলিল, "ওমা একি, চেহারা কেন এমন ধারা হয়েছে গো?——— "নীলিমা বাধা দিয়া খাটের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইল, সংক্ষেপে বলিল, "বাবুর কাল রাত্রে বড্ড জ্বর হয়েছে, তিনি কিছু খাবেন না। আর আমারও শরীর ভাল নেই, আমিও ভাতটাত কিছু খাব না।" নীলিমা নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিল, সেটা যে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাত, দাসী তাহা বেশ বুঝিতে পারিল; একটু গিন্নিপনার জ্ঞানবুদ্ধি দেখাইবার ছলে সহানুভূতির স্বরে বলিল, "ওঁর অসুখ হয়েছে বলে' তুমি কেন খাবে না, বাছা? না খেয়ে শুধু রাত জাগ্‌লে আর ভাব্‌লে কি আর শুচ্ছুরষা করা হয়? বলি, আমাদের কি আর কোনকালে সোয়ামী ছিল না, না,———"। নীলিমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি বুঝছ না, কাল রাত জেগেছি বলে' আমারও শরীরটা কেমন করছে, তাই ভাত খাব না। জলটল যা হয় খাব অখন। আর তোমায় দরকার হলে ডাকব," বলিয়া ঝির নূতন তত্ত্ব, উপদেশের মধ্যেই আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নবাগত বাবুটীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া হোটেলওয়ালা ঝিকে সঙ্গে লইয়া দেখিতে আসিল। কপালে হাত দিয়া বলিল, "বড্ড জ্বর হয়েছে ত! এখন কি উনি জেগে নেই?" নীলিমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, ঘোমটার ভিতর হইতে ঝিকে বলিল, "এতক্ষণ জেগেই ছিলেন, এই সবেমাত্র বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন।" ঝির গর্দ্দভ-নিন্দিত গলা বাজিয়া উঠিতেই অরুণ পাশ ফিরিয়া বলিল, "কে?" হোটেলের

স্বত্তাধিকারী বলিল, "আমি। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, ঘুমোন্।" অরুণ মুখ তুলিল। তাহার ললাটের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। হোটেল-কর্ত্তার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া বলিল, "ওঃ, আপনি ?" বলিয়া চিৎ হইয়া শুইল। একমুহূর্ত্ত পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "সে কই ?" বলিয়া ঘরের চারিদিকে একবার ব্যাকুল অনুসন্ধান করিয়া লইল। নীলিমাকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্বস্তির একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাশ ফেলিয়া আবার বালিশে মাথা রাখিল। তারপর চক্ষু বুজিয়া বলিল, "কটা বেজেছে বল্‌তে পারেন ?" হোটেল-ওয়ালা বলিল, "সাড়ে আট।" অরুণ ঐ অবস্থাতেই ধীরে ধীরে বলিল, "বারটার সময় একবার খবর নেবেন। আমাদের একটার গাড়ীতে রওনা হতে হবে কিনা। হোটেলকর্ত্তার মুখ শুকাইয়া গেল। জ্বরের আধিক্য দেখিয়া সে মনে মনে যে এক সপ্তাহের বিল প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা স্বপ্নের মত অলীক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার একেবারে মাথা ঘুরিয়া গেল, বলিল, "সে কি, আপনি ক্ষেপেছেন নাকি ? এই জ্বর নিয়ে কোথা যাবেন ? আর আমিই বা জেনে শুনে কি ক'রে ছেড়ে দি' ?" অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, আমায় যেতে হবে।" নীলিমা ঝিকে দিয়া বলাইল, "আজ যেয়ে কাজ নেয়।" শুনিয়া হোটেল কর্ত্তার নির্ব্বাণোন্মুখ আশা জাগিয়া উঠিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা' কি হয়, তা' কি আমি যেতে দিতে পারি ? উনিও ত বল্‌ছেন গিয়ে কাজ নেই।" অরুণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, না, আপনি জানেন না। মার অসুখ, আমাদের যেতেই হবে। আপনি একবার দয়া ক'রে বারটার সময় এসে আপনার পাওনাটা বুঝে নিয়ে যাবেন।" বলিয়া

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু বুজিল। নীলিমা আর কোন আপত্তি করিল না। এখানে ঠিকমত চিকিৎসা বা শুশ্রূষা হইবে না বলিয়া কোন রকমে রংপুর গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ভালই হইবে। হোটেল-ওয়ালা পূর্ব্বের ন্যায় এবার আর পোষকতা পাইল না দেখিয়া অগত্যা চুপ করিয়া গেল। অরুণ আবার হোটেলকর্ত্তার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাকে দয়া ক'রে আর একটা কাজ করতে হবে। ঝিকে আমাদের সঙ্গে দিতে হবে, এমন জ্বর নিয়ে একা একা যাওয়া উচিৎ নয়। আমি জ্বর সারলেই আবার তাকে নিজেই এখানে দিয়ে যাব। আপনাকে এ অনুগ্রহ করতেই হবে।" তাহার আর একা নীলিমার সঙ্গে থাকিতে সাহস হইতেছিল না।

১১

রংপুর পৌঁছিয়া নীলিমা দেখিল, তাহার মার অসুখ অনেকটা ভাল হইয়া গিয়াছে। একদিন হঠাৎ আছাড় খাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে বেদনা হইয়াছিল তাহাতেই তিনি এত পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বাসার সকলেই একটু চিন্তিত না হইয়া পারে নাই। এখন তিনি চলিতে ফিরিতে পারেন, এবং যদিও এখনও দুর্ব্বলতা একেবারে যায় নাই, তথাপি চিন্তার আর কোন কারণই ছিল না।

কিন্তু বাসার রোগী সারিয়া উঠিলেও যে নূতন রোগীটি আসিয়াই একেবারে শয্যাগ্রহণ করিল, তাহার জন্য আবার সকলেই পূর্ব্বেকার মত চিন্তিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িল। অসুখটা শুধু জ্বর বলিয়াই কেহ

তেমন আশঙ্কা করিল না; সরকারী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রোগীকে রাখিয়াই তাহারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল। যাহার ভাবনা জ্বরের অজুহাতে কমিল না, সে নীলিমা। নীলিমা জানিত, জ্বরটা আনুসঙ্গিক মাত্র, আসল যে রোগটা সেটাকে সারান ডাক্তারের পক্ষে দুঃসাধ্য। কাজেই সে একটু বেশীমাত্রায় চিন্তিত হইয়া উঠিল।

নীলিমা একেবারে অন্য সব চিন্তা ও কাজ ছাড়িয়া শুশ্রূষার সমস্ত ভার নিজের একেলার ঘাড়েই পাতিয়া লইল। সকাল হইতে রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা তাহার নিকট বসিয়া থাকিয়া সে একেবারে আহারাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল। কেহ তাহাকে বুঝাইতে পারিল না, অসুখটা এমন কিছু নয় যে তার শুশ্রূষার জন্য আর একজনের শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত পণ করা আবশ্যক। ক্রমাগত সাতদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র শুশ্রূষা করিয়া সে নিজেও যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, তাহা বুঝিয়াই সে আরও জিদ ধরিয়া শুশ্রূষাকারিণীর সমস্ত মায়া লইয়া বিপন্ন প্রাণটাকে রক্ষা করিবার জন্য যখন একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন ডাক্তারবাবু বারবার করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, রোগী এখন সারিয়া উঠিতেছে, আর তাহার যত্নের তেমন দরকার হইবে না। শুধু তাহাই নহে; নীলিমার শুষ্ক, শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার অবস্থাটা বুঝিয়া একটু কর্কশস্বরেই বলিলেন, "দেখ মা, তুমি যদি এমন জিদ ধরে' শুধু শুধু নিজেকে এমন নির্য্যাতন কর, তা' হলে আর আমি রোগী দেখ্‌তে আস্‌ব না। কেন, বাড়ীতে কি আর লোক নেই? রোগী এখন ভাল হয়ে উঠ্‌ছে, তবু তুমি অবুঝের মত নিজের একটা রোগ ডেকে আন্‌ছ!"

ডাক্তারের ধমক খাইয়া নীলিমা আর সেদিন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল না। মধ্যাহ্নে আহারের পর সে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিয়া সুধীকে রোগীর কাছে পাঠাইয়া শুইয়া পড়িল। সাতদিন ক্রমাগত নিদ্রাহীন হইয়া পরিশ্রম করায় সে আজ ঘুমে এত অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, যখন সে নিদ্রা হইতে উঠিল তখন সন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। ওদিকে অরুণ রোগশয্যায় পড়িয়া আছে, আর এদিকে সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে! সে তাড়াতাড়ি ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া রোগীর ঘরে গেল। বাহির হইতেই শুনিতে পাইল, সুধী ও অরুণ তাহার সম্বন্ধে কি কথা বলিতেছে। শুনিয়া পা টিপিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে মেজেতে বসিল। সুধীর তখন তাহার প্রসঙ্গ অরুণের নিকট উত্থাপন করা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। রোগটা সারিয়া উঠিবার পথে যদি একটা মনের ব্যাথা লাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তোলে, তাহা হইলে বড় খারাপ হইবে। আর কেনই বা সে তাহাদের আলোচনার বিষয় হয়, তাহাদের কি আর কিছু বলিবার নাই? যতই সে দূরে থাকিয়া আপনাকে ঢাকিয়া অশরীরি হইয়া যাইতে চায়, ততই ইঁহারা জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে সকলের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া দেয়,—লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাস্রোত তাহার অনিচ্ছায়ই সেই হোটেলে পূর্ণিমা রাত্রির দোহাই লইয়া যে ঘটনাটা আসিয়াছিল, তাহার দিকে বহিয়া চলিল। সে এক মন্ত্রমধুর রাত ছিল বটে, কিন্তু তাহার নিকট যে মুহুর্ত্তে সেটা একেবারে অন্ধকারে, নিশাচরের মাহেন্দ্রক্ষণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন তার আজও বেশ মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে

সে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে একটা ব্যথা অনুভব করিল। একটা অসংযত প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল দৌরাত্ম্যের মধ্যে পড়িয়া আর যেই পীড়িত হউক, অরুণ যে হইবে, তাহা তাহার কাছে বজ্রের মত কঠোর নিয়তি বলিয়া মনে হইল। আরও তাহার কষ্ট হইল এই মনে করিয়া যে, আলোর উদ্দেশ্যে যে জ্বলিয়াছিল, তাহাকে অন্ধকারে অজানা কোন শাসকের দণ্ড মাথা পাতিয়া লইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু কেন সে এমন করিয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া আঘাতের পর শুধু আঘাতই সহ্য করিয়া চলিয়াছে? নীলিমার মনে হইল, সেদিন অরুণ নিজেই বলিয়াছিল, 'বুকের ভিতর যখন হু হু করে' তখন কি করে' চুপ করে' থাকা যায়?' এ কথাটা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ আসা উচিত হইতে পারে, কিন্তু এ ত সত্য! তখন যে চুপ করিয়া থাকিতে পারে তাহাকে কি বলিয়া প্রশংসা অথবা নিন্দা করিতে হয়, তাহা সেও ত জানে না। তারপর হঠাৎ তাহার যে কথাটা মনে হইল তাহাতে নীলিমার মুখে একটা কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল, ভ্রূ আপনি কুঞ্চিত হইয়া আসিল। অরুণের এই যে হৃদয়ের ব্যথা তাহা কি সে রাত্রের ব্যাপারে দশগুণ বাড়িয়া যায় নাই? তাহার সে দিনকার নিজের জ্বালা মনে পড়িল, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বেশী জ্বালা যে অরুণের হইয়াছিল, তাহা সে ঠিক জানে। বুকের মাঝে তাহার কত মর্ম্মব্যথার ইন্ধন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কি আর সে বুঝিতে পারে নাই! কে তাহাকে এমন করিয়া পুড়িয়া মারিল? সে ত সে আপনিই। কেন সে সব জানিয়া শুনিয়া তাহার সঙ্গে আসিল? কেন সে তাহাকে হোটেলে বাহিরে শুইতে দিল না? কেন সে তাহাকে সর্ব্বদাই নিজের এত কাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? ছি, ছি, সে কি একটা কুহক

ছড়াইতেছিল নাকি ? আপনার উপর ঘৃণায় নীলিমার সর্ব্বশরীরে জ্বালা ধরিয়া গেল। ভারী সে স্নেহ দেখাইতেছিল! এ কি একটা আদরের ভাণ নয় ? অমন আদর না দেখাইলে কি তার চলিত না! তাহার আশা, সব চেয়ে তাহার ঐ আন্তরিক স্নেহের বুকভরা গৌরবটাকে সে অমন করিয়া খেলিয়া খেলিয়া আঘাত দিতেছিল! কি পোড়া কপাল তাহার, সে যত নীচে থাকিয়া নিরাপদ হইতে চায়, ততই এক দুর্নিবার নির্ব্বন্ধ তাহাকে উপরে তুলিয়া একটা বৃথা, অসঙ্গত গর্ব্বে ফাঁপাইয়া তোলে। হায়, হায়, কেমন করিয়া সে নিজের সঙ্গে সকল অমঙ্গল লইয়া দূরে সরিয়া যাইবে!

সুধী নীলিমাকে খুঁজিতে আসিয়া দেখিল, সে জানালার কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। একটু রাগতভাবে বলিল, "বেশ, তুমি এখানে বসে' আছ, আর অরুণ যে তোমায় কেবলই ডাক্‌ছে। তুমি আজ সারাদিনেও সেখানে যাও নি, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ! তোমার কেমন ধারা যে ভাব, আমি বুঝ্‌তেই পারি না।" রাগটা যে এখানে আসিয়া হয় নাই, ওঘর হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া সুধী একটু বিব্রত হইয়া পড়িল; সুর যথাসাধ্য কোমল করিয়া বলিল, "ওখানে একটিবার যাও না।" নীলিমা কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার মুখের সেই কঠোর ভাবটা সুধীর লক্ষ্য এড়াইল না, ভয় হইল, নীলিমা কি বিরক্ত হইয়াছে ?

নীলিমা রোগীর ঘরে ঢুকিতেই তাহার মৃদু ঝিঞ্জিনীতে চমকিয়া অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?" নীলিমা বরাবর গিয়া শয্যার উপর তাহার

শিয়রের কাছে বসিল, মাথা নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি"। অরুণের মুখে একটা বেদনা বিকৃত মলিন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। শান্ত অনুযোগের সুরে সে বলিল, "আজ তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে? একটি বারও ত এখানে আস নি!" নীলিমা বলিল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, উঠ্‌তে বড় দেরী হয়ে গেছে, তাই এতক্ষণ আস্‌তে পারি নি। আপনি কি রাগ করেছেন?" অরুণ স্মিতমুখে বলিল, "না। সে পথ তুমি নিজেই বন্ধ করে' দিয়েছ। তার জন্য তোমার আর কোনদিন ভাব্‌তে হবে না।" নীলিমা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। অরুণ আপনার দক্ষিণ হস্ত মাথার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "তোমার হাতখানা একবার দেবে?" নীলিমা তাহার প্রসারিত হস্তের উপর তাহার নিজের হাত রাখিল। অরুণ ধীরে ধীরে হাতখানাকে তাহার দুই হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার হাতখানা কি নরম! কিন্তু বড় ঠাণ্ডা। তোমার বুকের ভিতরটাও বোধ হয় এমনি ঠাণ্ডা?" তারপর নীলিমার হাতখানি আস্তে আস্তে লেপের নীচে তাহার বুকের উপর রাখিল, ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ দেখি, আমার বুকের ভিতরটা তেতে আছে কি না। সেখানে একটা দেশ আগুনে পুড়ে গেছে, তার ছাইগুলোতে বোধ হয় এখনও আগুন একটু একটু জ্বলছে। ধ্বক্ ধ্বক্ করছে না?" নীলিমা বলিল, "আপনি পাগলের মত ও কি বক্‌ছেন? ছিঃ, আপনি পুরুষ, আপনার কথা আরও সংযত হওয়া উচিত," বলিয়া হাতখানা আস্তে আস্তে টানিয়া লইল। অরুণ চক্ষু বুজিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "তা ঠিক। এ সব কথা শোন্‌বার মত তোমায় আমার সম্বন্ধ নয়।" নীলিমা বলিল,

"আপনি ঐ সব কথা এত ভাবেন কেন? বেশী চিন্তা করা ত রোগ সারার উপায় নয়।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "আপনি আমায় ডেকেছিলেন কেন?" অরুণ চিন্তিত মুখে বলিল, "কই না, আমি তোমায় ডাকব কেন?" নীলিমা বলিল. "আমায় তাই বল্লে। সে যাক, আপনি ত সেরে উঠ্‌ছেন, এখন আমার রোজ না আস্‌লেও চল্‌বে, না?" অরুণ বলিল, "হাঁ"। নীলিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অরুণ বলিল, "একটু দাঁড়াও। আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্ছি না। বল তুমি আমায় ক্ষমা করবে?" কোটরাগত চক্ষু তুলিয়া অরুণ এক দৃষ্টে নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। আনতমুখে নীলিমা বলিল, "না।" অরুণ ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন না?"—তাহার বুকের ভিতরটা জমাট হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কাঁপিতেছিল। নীলিমা বলিল, "আপনার ত এ প্রশ্ন করবার অধিকার নেই। তবু আপনাকে বলা ভাল,—আমি ক্ষমা করলে ভগবান আপনাকে ক্ষমা করবেন না যে।" বলিয়াই সে ধীর অথচ ক্ষীপ্র গতিতে বাহির হইয়া গেল।

সুধী যখন রাত্রে আহারের পর রোগী দেখিতে আসিল, তখন অরুণ বিমূঢ়ভাবে শয্যার উপর পড়িয়াছিল।

১২

গ্রামের ঠিক বাহিরেই একটা নূতন ছাউনি করা খড়ের ঘর। শুধু একখানা। গ্রামের অঞ্চলপ্রান্ত টানিতে গিয়া কোন্ এক যাদুকরী বিদ্যায় যে সীমাহীন সবুজ মাঠটা সেই অজ্ঞাত তেপান্তরের মাঠের মত ধূ ধূ

ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারই ওপারে সূর্য্য তখন এক দেবতার ভাস্বর মস্তকের মত নির্ম্মল চৈত্র-আকাশে আগুন জ্বালাইয়া ধীরে 'ধীরে ডুবিতেছিল। দক্ষিণের হাওয়া তখন বাসন্তী গাহিয়া ঘরের পিছনে এক-মাত্র বকুল গাছটায় ঝির্ ঝির্ করিয়া একটা স্পর্শ পুলক জাগাইতেছিল। কিন্তু ঐ ঘরটাকে মাত্র সাক্ষ্য রাখিয়া যে পৃথিবী তখন তার অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছিল, সেখানটা একেবারে মৃত্যুর মত নীরব, গম্ভীর। দুই একটা পাপিয়া কি দোয়েল কোথা হইতে যেন ডাকিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে গাম্ভীর্য্যটা ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়া আরও বেশী করিয়া গুমোট হুইতেছিল।

ঘরের বাহিরে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া ঐ ডুবু ডুবু লাল সূর্য্যটার দিকে চাহিয়াই অরুণ ভাবিতেছিল, বেশ, ঐ সুন্দর সূর্য্যটা কি পৃথিবীর শেষে এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া মমতাভরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না! অনন্তকালের প্রথম মুহূর্ত্তেও যখন ঐখানটিতেই ডুবিয়া যাইতেছিল তখনই আজ এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন্ অজ্ঞাত শৃঙ্খল যে উহাকে তিল তিল করিয়া দুর্নিবার নিয়মে নীচের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। আজ যদি সে মুহূর্ত্তের জন্য, শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য, হঠাৎ থামিয়া যায়, অনন্ত কাল, অনন্ত পথ, অনন্ত নিয়মের তাহাতে কি আসে যায়? চির পুরাতনের সনাতনত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত যদি নূতন হইয়া উঠে, তবেই ত শুধু চির আনন্দ, চির সৌন্দর্য্য!

সৌন্দর্য্যের কথা মনে হইতেই হঠাৎ তাহার বুকের কোথায় যেন একটা বেদনা বাজিয়া উঠিল। ঐ যেখানটায় বেদনা লাগিল, ঐখানেই তার একটা সৌন্দর্য্যের রাজ্য আছে, সেইখানে বোধ হয় চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে! সেখানকার মন্দিরে বোধ হয় নীরবে আরতি চলিতেছিল, ঘণ্টার শব্দে সেটা থমকিয়া স্থির হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার বক্ষ মথিয়া একটা আকুল দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। বেদনাটা যে পুঞ্জীভূত ছিল, তাহা কি সে দিবারাত্রি প্রতিক্ষণে অনুভব করিত না, আর ইহাও ত সে ভাল করিয়াই জানিত যে, যখনই বিশ্বের ভাল তাহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তখনই ঠিক এমনি একটা সুখ মাখা বেদনা জাগিয়া উঠিয়া ঠিক এমনি একটা দীর্ঘনিশ্বাসে বাহির হইয়া গিয়াছে। এই পুরাতন ব্যথাটার কিন্তু চিরনবীনত্ব ছিল, তাই তার আঘাতে এত প্রাণ ভয়ে, আজও ঐ পশ্চিম আকাশের কালিমার দিকে আধ-উদাস, আধ-আকুলভাবে চাহিয়া থাকিতে অরুণের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

ভগবান ক্ষমা করিবেন না! অমন ভালবাসা ভরা হৃদয়ের ভাষায় অমন সুন্দর মুখে এ কি কথা! ওগো, প্রাণের অধীর তীব্র উথল চাপিয়াও কি তোমার কোন রূঢ় তেজ বিষাদপূর্ণ, কৃত্রিম শান্তি উপরে অটুট রাখিবে? কত বিনিদ্র রাত্রি, চাঁদের কিরণ যখন জানালা দিয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িত, সে তাহার শয্যায় পড়িয়া থাকিতে বিস্ময়ে ভাবিয়াছে, কেন?—কেন ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন না? তাঁর কাছে সে কি অপরাধ করিয়াছে? তাঁর কাছে ক্ষমা মাগিবার তার কি আছে?

পিছন হইতে ক্ষুদ্র কণ্ঠে কে ডাকিল, "বাবু"। তাহার বালক ভৃত্যটী আসিয়া চেয়ার ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। অরুণ শুধু তার ডাগর চোখদুটির দিকে একবার চাহিল! দোলা ধীরে ধীরে বলিল, "সন্ধ্যা ত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে; তোমার আসন পেতে এসেছি।" "যাই", বলিয়া অরুণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। আকাশে যে

চাঁদটা এখনই ভাসিয়া উঠিয়াছে,তাহার স্তিমিত আলোতে অন্ধকারটা তরল হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত মাঠটাই তখনও আব্ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। অল্পদূরে কুটীরের আলো লক্ষ্য করিয়া অরুণ চলিল, পশ্চাতে চেয়ার লইয়া দোলা। দোলা সবে তিনমাস হইল অরুণের সঙ্গে আছে, কিন্তু এই কয়দিনেই প্রভুর সে একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ক্ষুদ্র বালক-হৃদয়ে মা-বাপ-মরা অনাথের দুঃখ ঘুচিয়া গিয়া এই অল্প সময়েই একটা হারান স্নেহের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। এমন কি, প্রভুর গুপ্ত বেদনাটা ইতিমধ্যেই তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। এই যে প্রতি সন্ধ্যায় অরুণ বাহিরে একখানা কেদারায় বসিয়া মাঠের ওপারে তাহার কি অব্যক্ত চিন্তা নীরবে প্রেরণ করিতে থাকে, খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কি ভাবিয়া চক্ষু তাহার আপনা হইতেই মুদিয়া আসে, মস্তক ঈষৎ হেলিয়া পড়ে, এই যে জনহীন প্রান্তরের খোলা হাওয়ায় তাহার অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাস মিলাইয়া দিতে সে এখানে কুটীর বাঁধিয়াছে,বৈকালে কোন কোন দিন মাঠে দোলাকে লইয়া বেড়াইবার সময় হঠাৎ থামিয়া গিয়া একবার শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার আন-মনা চলিতে আরম্ভ করে,—এই বেদনা-জড়িত ঔদাসীন্যের অর্থ উদ্ভাবন করিতে দোলা তাহার জাগ্রত সময়টুকুর অধিকাংশ খরচ করিয়া করিয়া শুধু তাহার প্রভুর মতই নীরব, গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল। কোন সময় ভাবিত, তাহারও বোধ হয় মা নাই; অমনই দোলার চক্ষু সহানু-ভূতিতে সজল হইয়া উঠিত। কখনও ভাবিত, প্রভুর জীবনের কোন আশা হয়ত মিটে নাই; তখন ভাগ্যসংগ্রামে বিজিত হতভাগ্যকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত,—বুঝি এই পরাজিতের

নিকট নিজে হারিয়া গিয়া সেই সান্ত্বনার গৌরব অনুভব করিত। সেই কি এতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিয়াছিল? সে সেদিন ত স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেন এমন, কিসের তার দুঃখ? প্রশ্ন শুনিয়া অরুণের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়াছিল; তাই ত আর সে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই। আজও সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অরুণ তাহার আহ্নিক সারিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যখন বাহিরে আসিয়া একখানা মাদুর বিছাইয়া বসিল, সঙ্গে সঙ্গে দোলাও তাহার নিকট ঘাসের উপর পা গুটাইয়া বসিল। তখন চাঁদ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। নবমীর সেই চাঁদটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অরুণের চক্ষু ধরিয়া আসিতেছিল। এই স্থির, অচপল উপাসনা, তারপর আবার তেমনি ধীর, উদাসীন, উধাও দৃষ্টি—দোলা জানিত, ইহার একটা বড় তিক্ত অর্থ আছে। অমন একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা তাহার আর সহ্য হইল না। কাছে আর একটু ঘেসিয়া আসিয়া সে মৃদু-স্বরে ডাকিল, "বাবু"! অরুণ চমকিয়া মাথা ফিরাইল; দোলাকে দেখিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কেন এখানে চুপটি করে বসে' আছিস্ রে?" দোলার একেবারে কান্না পাইল; কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "তুমি কেন এমন ধারা কর বাবু, আমায় বল না।" অরুণ অল্প হাসিয়া বলিল, "কই, কেমন ধারা রে?"

"এই যে একা একা চুপ করে থাক, সদাসর্ব্বদা কি ভাব।" এই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের মুখ দিয়া তাহার বাহ্যিক ভাবটার কথা শুনিয়া অরুণ যেন একটু লজ্জিত হইল। এখনও লজ্জার অবসর আছে! পর-মুহূর্ত্তেই একটু গম্ভীর হইয়া সে বলিল, "না, ও কিছু নয়।"

দোলা জিদ ধরিয়া বলিল, "না, নয় কিসে! আমাকে বল্‌তেই হবে। আমি ত সে দিনও জিজ্ঞেস্ করেছিলুম, বাবু।" শেষের কথাটায় সে যেন একটা দাবী জানাইল। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "তা' তোর শুনে কি হবে? আমি না হয় বল্লুমই, তুই ত আর তার কিছু বুঝ্‌তে পারবি না।" দোলা বলিল, "কেন পারব না,—তুমি বল না।" অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা তুই কি ভাবিস্ বল্ ত"। "অমার যে বল্‌তে ভয় হয়", বলিয়া দোলা মাথা নীচু করিল। অরুণ একটু উৎসুক হইয়া বলিল, "কি বল্ না।" দোলা মাথা তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবু, তোমার কি মা মরে গেছে?" অরুণ ক্ষুদ্র একটি "না" বলিয়া মাথা ফিরাইয়া আবার একবার উপরের দিকে চাহিল। পরক্ষণেই সে দৃষ্টি নামাইল;—অমনভাবে চাওয়া যে একটা ঈঙ্গিতেরই সামিল, এ বালক বুঝি বা ধরিয়া ফেলিতে পারে। দোলা চুপ করিয়া অন্য একটা কারণ খুঁজিতেছিল; হঠাৎ বলিল, "তবে কি বৌ মারা গেছে?" অরুণ একটু হাসিল। বালক এখনও জানে নাই যে, যমঃ সকলের চেয়ে বেশী দুঃখের কারণ নয়। সুখের মধ্যে যে দুঃখটা একেবারে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে, তার ঝাঁজটা যে সব চেয়ে অসহ্য, তাহা বুঝিবার বয়স ত তার এখনও হয় নাই। আদরের সুরে "না,—রে", বলিয়া মৃদু পৃষ্ঠতাড়ন করিল। দোলা আবার ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে বিদ্যুৎগতিতে আর একটা সম্ভাবনার চিন্তা খেলিয়া গেল। মুখটা একটু বাড়াইয়া চোখে মুখে নবাবিষ্কারের আগ্রহ ফুটাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে বুঝি তোমার বৌ তোমায় ভালবাসে না,—না বাবু?" এটা যে বিশেষ কোন দুঃখের কথা, তাহা সে নিজে না বুঝিলেও পরোক্ষ

প্রমাণে তাহা সে যথেষ্ট বিশ্বাস করিত। অরুণ সুস্পষ্ট চমকিয়া উঠিল। বালকের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিল। তাহার মুখে ছিল শুধু একটা সরল একাগ্রতা। অরুণ মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া অস্ফুটস্বরে আপনাকেই যেন বলিল, "না, তাও ঠিক নয়"। তারপর হাসিয়া বলিল, "যা, তুই কিছু বুঝ্‌বি না। তোর শুনে কাজ নেই।"

কিন্তু আসল কথাটা যা, তা'ত ও নয়। দোলাকে বলিল বটে, "শুনে কাজ নেই", কিন্তু ঐ তার গুপ্ত বেদনাটার কথা যদি সে কাহাকেও প্রতিদিন নূতন নূতন ভাবে, নূতন নূতন ভাষায় বলিতে পারিত, তাহা হইলে সে যে শুধু আনন্দ পাইত, তাহা নয়, অনেক হাল্কাও ত হইতে পারিত। শুধু এই বালককে বলিতেই ত যত দোষ। একমাত্র যাহার কাছে বলিয়া নিঃশেষ করিতে গিয়া শুধু ভরিয়া উঠিবার আনন্দ সে পাইতে আশা করিতে পারে, সে সুধী। তাই আর তাহার বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর সে কি বলিবারই কথা; বলিতে গেলে সে জিনিষ যে অনেক খাটো হইয়া পড়িবে। তবু যদি কিছু বলিতে পারিত।

দোলা কিনারার এত কাছে আসিয়া 'সিসেমে'র দরজা হঠাৎ বন্ধ হইতে দেখিয়া দমিয়া গিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অরুণ তাহার মাথাটা কোলের উপর রাখিয়া তাহার সারল্যমণ্ডিত মুখখানার উপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "স্থাখ্ দোলা, তুই যখন বড় হবি, তখন ত তোকে বিয়ে করতে হবে, কেমন না?" দোলা লজ্জায় তাহার কোলে মুখ লুকাইল। অরুণের বুকের মধ্যে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। এ কি লজ্জা! কিন্তু কেমন মধুর! তাহার মনে হইল, আর

একখানা মুখ ইহা অপেক্ষাও অকারণে ঘোমটার নীচে রাঙ্গা হইয়া দরজার আড়ালে হঠাৎ লুকাইয়া পড়িত। কিন্তু সেটা একটা অশরীরি মাধুর্য্য, তাহার কথা এখানে কি করিয়া আসে? অরুণ জোর করিয়া দুইহাতে দোলার মুখটা মুক্ত করিয়া ধরিল; একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু স্থাখ্, তুই বিয়ে করিস্ নি।" এবার দোলার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল, সবিস্ময়ে বলিল, "কেন?" অরুণের মুখে একটা বেদনার বিকৃতি অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তেমনই গম্ভীরভাবে বলিল, "না, না করাই ভাল।" তারপর মুখখানা হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া একটু উত্তেজনার সুরে বলিল. "কেন করবি? তুই যাকে বিয়ে করবি, মনে কর্, তাকে যদি অন্য কেউ তোর চেয়েও বেশী ভালবাসে?" এ যুক্তি অকাট্য বলিয়াই দোলার বোধ হইল; তাই যুক্তিটা মানিয়া লইয়া সে ঘুরাইয়া বলিল, "আমি এমন দেখে না হয় বিয়ে করব, যাকে আমিই সব চাইতে বেশী ভালবাসি।" অরুণ পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিল, "তা কি করে' বুঝবি? আর, না হয় এমন দেখেই বিয়ে করলি, কিন্তু বিয়ের পর যদি কেউ তোর বৌকে তোর চেয়ে বেশী ভালবেসে ফেলে।" এবার আর দোলা উত্তর করিতে পারিল না; ভ্রূ সবিস্ময়ে উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "তাই ত, তবে ত বড় মুস্কিল। তা'হলে কি হয়?" অরুণ বলিল, "তাই তুই বিয়ে করবি না, কেমন?" দোলা ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা"

এই সরল, বিশ্বাসভরা ক্ষুদ্র প্রাণটায় যে তাহার অজ্ঞাতে অরুণ এমন করিয়া একটা অজানা ঘা মারিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইল, ইহাতে বোধ হয় কিছু সুখ ছিল,—অন্ততঃ অনেকটা আশ্বস্তি ছিল। পৃথিবীর কোন একজনকে যে সে এত সহজে তাহার বিশ্বাস, তাহার ধর্ম্ম, তাহার

মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিল, ইহাতে অরুণ আপনাআপনিই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই দোলাটা যেন এ পৃথিবীরই নয়; অথবা সে জানে না, সে পৃথিবীর চক্ষে কত বড় বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু যে বিদ্রোহী, তাহারও সঙ্গীর এত প্রয়োজন যে, অরুণ যখন তাহার এই নম্র শিষ্যটির ঘাড়ে তাহার প্রাণের বোঝার একটা কল্পিত অংশ চাপাইয়া দিয়া প্রকাণ্ড কোন সত্য উদ্ধারের বিজয়গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল, তখন তাহার ভাবিবার অবসর হয় নাই যে, তাহার সুন্দর সত্য তখন মহম্মদীয় ধর্ম্মের মত একহস্তে তরবারি লইয়া অসুন্দর হইয়া গিয়াছে। সে যদি এমন করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাহার মতে টানিয়া আনিতে পারিত, তাহাতেও সে লজ্জিত হইত না।

১৩

রংপুর হইতে আসিবার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রা করিবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে অরুণের চোখ দুইটি ধীরে ধীরে পশ্চাৎপানে কাহার অনুসন্ধানে ঘুরিয়া আসিল। সুধী যখন প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল, তখন সে রোগ হইতে সারিয়া উঠিবার পথে। সুধী চলিয়া আসিবার পর হইতে যে নীলিমার তাহার ঘরে যাতায়াত ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল, তাহা সে গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। যতদিন সে শয্যাশায়ী ছিল, ততদিন নীলিমা তাহার নিকটে সকালে কিম্বা দ্বিপ্রহরে এক আধবার আসিত বটে, তাহাও বেশীক্ষণের জন্য নহে। কিন্তু যেদিন সে মৃত্যুর আহ্বান প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করিয়া শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, সেইদিন হইতে নীলিমার দেখা সে কচিৎ এক আধদিন পাইয়াছিল

মাত্র। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না, নীলিমাকে দেখিবার জন্য বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্যও ছিল না। বারান্দায় একখানা কেদারা টানিয়া সে সমস্ত দিনটা চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিত। ক্লান্তির সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া সে বাহিরে জড় হইয়াই পড়িয়া থাকিতে ভালবাসিত। মধ্যে মধ্যে পিপাসা লাগিলে কিম্বা পাথার দরকার হইলে সে ভুলে হয়ত একবার কেদারার পার্শ্বে কাহার উদ্দেশ্যে ফিরিয়াই আবার পূর্ব্ববৎ চক্ষু বুজিয়া কেদারার বক্ষের উপর ঢলিয়া পড়িত। সে জানিত না, তাহার এই ক্ষণিক চঞ্চলতা সর্ব্বদাই গোপন থাকিত না,—হয়ত সেই মুহূর্ত্তেই 'দক্ষিণ পবন দ্বারে দিয়া কান' তাহার কামনা শুনিয়া বহিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া শত যত্ন, শুশ্রূষার মধ্যেও অনাদরে যখন সে একটু সবল হইয়া উঠিল, তখন একদিন এক পৌষ-প্রত্যূষের কন্‌কনে শীতে সর্ব্বাঙ্গে একটা আলোয়ান জড়াইয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—এক অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার পথে। তাহার আর পড়িবার ইচ্ছা ছিল না; তাই সে এবার বিশ্বের বিশাল পাঠাগারের এক-কোণে লুকাইয়া পড়িয়া মস্তিষ্কহীন ছাত্রের ভিড়ে জমিয়া যাইবে, আর সেইখানেই সে মনগড়া তাহার প্রকাণ্ড পাঠটাকে আমরণ আবৃত্তি করিতে থাকিবে। কেবল তাহার অধ্যবসায় কাহারও অপেক্ষা কম না হয়, ইহা দেখিলেই চলিবে। জীবনের ত এমনি একটা বড় কাজের জন্য, সে আজ স্পষ্ট বুঝিল, তাহাকে তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই বিকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বিধানের কাছে তাহার কোন অনুযোগ নাই,—বরং ধন্যবাদ আছে।

সে ফিরিয়া দেখিল, উপরে জানালার কাছে নীলিমা দাঁড়াইয়া। পরণে তার একখানা সবুজ সাড়ী,—এ সাড়ীখানাকেও অরুণ বোধ হয় ভাল

করিয়া চিনিত ; কাণের দুলগুলি যেন একটু একটু দুলিতেছিল, সিঁথির সিন্দুর প্রভাত-আলোয় একটু কি জ্বলিতেছিল না ? শুধু এক মুহুর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময়। তারপর যখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, তখন অরুণের মনে হইল, সে মুখে কোন ভাবই ছিল না। আশ্চর্য্য ! কিন্তু কোন ভাব ছিল না বলিয়াই তাহার বুকটা হঠাৎ কি একটা আবেগে ভরিয়া উঠিয়াছে, কারণ তাইত তাহার মনে সম্ভাবনার বিস্তৃত একটা রাজ্য খুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিসের সম্ভাবনা ?—নীলিমার চিন্তার, তার ভাবের ? তাহাতে তার কি আসে যায় ? অরুণ একটা ব্যথা পাইয়া চমকিয়া উঠিল। যায় বৈ কি, তাহার সমস্ত জীবনটার—একটা দুর্লভ জন্মের—অর্থই যে সেই ভাবব্যক্তির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ! এমন পরাধীনতার চিন্তায় তাহার হৃদয়টা আনন্দ-উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার ত বিস্তর কাজ পড়িয়া আছে—জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসা।

ষ্টেশনে আসিয়া অরুণ মুস্কিলে পড়িয়া গেল। সে কোথায় যাইবে পূর্ব্বে তাহার কিছুই ঠিক করিয়া আসে নাই। নীড়ে মাতৃক্রোড় হইতে যেদিন পক্ষীশাবক প্রথম আকাশে উড়াল দিয়া দিগন্তের মাঝে আপনা-হারা হইয়া যায় আজিকার দিনও অরুণের নিকট তেমনই একটা দিনের মত বোধ হইল। কিন্তু ঠিক তেমনই কি ?

স্মৃতির একটা স্বর্ণসূত্র যে তাহার অন্তর হইতে বহিয়া গিয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহা সে বেশ অনুভব করিতেছিল। যে রক্তধুলাময় রাস্তাটা ষ্টেশন হইতে তাহার পূর্ব্ব-আশ্রয়ের দিকে কি একটা মমতাপূর্ণ ইঙ্গিত করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার শেষপ্রান্ত, পর্য্যন্ত—যেখানে তরুছায়ার অন্ধকার অন্তরালে সেটা নির্ম্মম ভাবে ঘুরিয়া

গিয়াছে—সেই পর্য্যন্ত সে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। চাহিয়া থাকিতে তাহার চক্ষে জল আসিল ;—বোধ হয়, ঐ পথটার শেষে একটা বাগান-ঘেরা বাড়ীর এক জানালার একখানা সবুজ সাড়ী, কাণের দু'ল, সিঁথির সিন্দুর আর একখানা মুখ তাহার দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। ঐখানে যে আছে শুধু মায়া, শুধু লাবণ্য, শুধু বুকভরা প্রীতি, তাহা সে জীবনের পথে ঐখানটায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধ নয়নে দেখিয়া আসিয়াছে।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া হু হু শব্দে ট্রেন আসিয়া পড়িলে সে তাড়াতাড়ি একখানা খুলনার টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিল। বাড়ী না যাইবার সঙ্কল্প পূর্ব্বেই তাহার করা ছিল।

অবসন্ন ভাবে একখানা বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া গাড়ীর খোলা জানালার উপরে দুই হাতের বেষ্টনীর মধ্যে মাথা লুকাইয়া সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। গাড়ী যখন রংপুর ষ্টেশন হইতে ছাড়িল, তখন সে মাথা তুলিয়া দেখিল না—সেই পথটা অনেকক্ষণ বাঁক ঘুরিয়া আসিয়াছে, আর তাহারই এক প্রান্তে একটা বাগান-ঘেরা বাড়ীর এক জানালায় একখানা সবুজ সাড়ী কাণের দু'ল, সিঁথির সিন্দুর আর এক খানা মুখের কল্পনা ধরিয়া সে প্রভাত কিরণে চিক্‌মিক্ করিতেছিল। গাড়ীটা তখন তাহাকে লইয়া সারাবিশ্বের মাঝে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কতক্ষণ সে এমন ভাবে পড়িয়াছিল, তাহার কোন অনুমান সে রাখিতে পারে নাই। কিন্তু যেটা তার জানা উচিত ছিল সেটাও সে জানিতে পারে নাই, তাহা পার্শ্বে উপবিষ্ট তরুণ ভদ্রলোকটি লক্ষ্য করিয়া উত্তরোত্তর কেবলই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল। পরেশ বন্দোপাধ্যায়ই এ

বড়দিনের বন্ধে রংপুর জজকোর্টের মমতা ত্যাগ করিয়া বিরহ-বিধুরা পত্নির মুখে মিলনমধুর হাসি দেখিতে বাড়ী চলিয়াছিলেন। নব্য ওকালতীর রৌপ্যসংস্পর্শহীন আড়ম্বর ইতিমধ্যেই তাহাকে বিশেষ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহা ছাড়া সে যে নিজের নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিতেই পূজায় বাড়ী না গিয়া আসামের খালবিল জঙ্গল ঘাটিয়া হয়রাণ হইয়াছিল, তাহার জন্য তাহার গৃহদেবতা তাহাকে ক্ষমা করিতে চাহিলেও সে নিজেকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাই আজ একটা পুরাতন খবরের কাগজের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ঘনাইবার ভাণ করিয়া সে যখন তাহার গৃহমুখী উদ্দাম মনটাকে সংযত করিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় নতশির অরুণের দীর্ঘনিশ্বাসে সে চমকিয়া উঠিল।

এই যে লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া নিতান্ত ব্যথিতের মত মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া ছিল, পরেশ অরুণের তরুণ বয়স দেখিয়া মনে করিল, সে ইহার দুঃখের কারণ বোধ হয় নির্দ্দেশ করিতে পারে। কিন্তু পরেশের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল এই যে, লোকটার একটুও সংযমশক্তি নাই। সে নিজে এত বড় একটা আনন্দ কেমন খবরের কাগজটা দিয়া সকলের দৃষ্টি হইতে বেমালুম এড়াইয়া রাখিয়াছিল! মানুষের এতখানি দুর্ব্বলতা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে একটু সুবিধা খুঁজিতেছিল তাহার বিরক্তি এই দুর্ব্বলহৃদয় যুবককে জানাইয়া দিবার জন্য।

এইবার ষ্টেশনে গাড়ী ধীরে ধীরে থামিতেই পরেশ উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিয়া গাড়ীর ঝাঁকানিতে একবারে অরুণের ঘাড়ে পড়িয়া গেল। অরুণ একবার মাথা তুলিয়া পরক্ষণেই আবার সংবদ্ধ বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

পরেশ দেখিল, তাহার কৌশলটা ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অনুতপ্তহৃদয়ে বলিল, "মাপ করবেন, গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গেছে, তাই—।"

অরুণ তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে একটু থতমত খাইয়া গেল। সহৃদয়তা, বুঝি একটু করুণাও তাহার মুখে স্পষ্ট ফুটিয়াছিল। উন্নত ললাটে একটি কুঞ্চনও নাই, শুধু দুই একটা স্ফীত শিরা মনে তাহার যে স্রোতোবেগ অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সংবাদ দিতেছিল। পরেশ যে দুঃখকাতর মুখ দেখিবে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে সে দেখিল সেখানে আনন্দই শুধু ম্লান হইয়া রহিয়াছে—দুঃখের বিশেষ চিহ্ন নাই। পরেশ যোড় হাতে বলিল, "আপনার উপর পড়াটা স্বেচ্ছায় হয় নাই, মাপ করবেন।" অরুণ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি একটা সামান্য কারণে অত অনুতপ্ত হোচ্চেন কেন?" "না, তবে কিনা———" বলিয়া পরেশ তাহার পাশে আরও ঘেঁসিয়া বসিল, তারপর একটু অনুযোগ দিয়া বলিল, "আমরা একসঙ্গে এতটা পথ এলুম, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করার সৌভাগ্যই হয় নি। সহযাত্রীদের মধ্যে সাধারণতই একটু আত্মীয়তা জন্মে' যায়, এবং সেটা যে প্রত্যেকেই দরকার ব'লে মনে করে, তাতে কাকেও দোষী করা যায় না," বলিয়া একটু হাসিল। অরুণ বলিল, "যদি আমাদের আলাপ পরিচয় না হয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণই আমার দোষ, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এখন আলাপ করবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমার কেমন একটা দুর্ব্বলতা আছে, আমি প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনদিনই যুঝ্‌তে পারি না। আমার বিশ্বাস আপনি আমার এত বড়

দুর্ব্বলতাও মাপ করতে পারেন।" তাহার চোখে যেন প্রকৃতই একটা করুণাভিক্ষা ছিল, তাই পরেশ প্রথমটা কেমন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণের শেষ কথাটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলিল, "আমার কথাটা বোধ হয় অসভ্যের মতই কর্কশ শোনাবে, কিন্তু আমি না ব'লে থাকৃতে পারলাম না যে, আমি এই একমুহূর্ত্ত আগে ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম যে, আপনার সংযমশক্তি আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়।" অরুণ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, কাজেই সে প্রত্যুত্তর করিল না। পরেশ বলিল, "আপনি ভাব্ছেন, আমি কি ক'রে তা বুঝ্লাম। আপনি এই যে কিছুক্ষণ আগে একটা জোরে নিশ্বাস ফেল্লেন তার সঙ্গে আপনার এই এতক্ষণ একভাবে অবসন্নের মত প'ড়ে থাকা যোগ করলে যে কথাটা বাইরে থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তাতে অন্যের আপনার উপর সহানুভূতি হলেও আমার রাগ হয়েছিল যে ঐটুকু চেপে আপনি অপরের অযাচিত সহানুভূতি থেকে আপনাকে রক্ষা করেন নি।" অরুণ বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কথাটা তাহার অপ্রিয় না ঠেকিলেও সে আশ্চর্য্য বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু নম্র আগ্রহে বলিল, "আপনি যেন কেমনধারা কথা বল্‌ছেন। আপনার কথায় একটু ঝাঁজ আছে, যার অর্থ আমি ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" পরেশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আছে। কিন্তু তার আগে আপনার আমার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া দরকার এবং তারও আগে আপনার পরিচয় আমাকে দেওয়া প্রয়োজন। আপনি বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন?" অরুণ মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, পরে বলিল, "আমার পরিচয় অল্প কথায় হবে। আমার নাম অরুণপ্রকাশ

গঙ্গোপাধ্যায়, বাড়ী বিক্রমপুর, এইবার বি, এ, পাশ ক'রে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বেগার ব'সে আছি।" পরেশ বলিল, "আপনার বাকী এবং আধুনিক পরিচয়টার জন্য আমি এখন অনুরোধ করবো না।" অরুণ সুস্পষ্ট চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশ করিল। পরেশ না থামিয়াই বলিল, "এইবার আমার পালা। আমার নাম পরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বাড়ী ফরিদপুর জিলায়, রংপুরে ওকালতী করি, অবশ্য পয়সা পাই না।" তারপর অরুণের মুখের উপর তার স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "এটা অবশ্য আমার বাইরের পরিচয়, এবং এতেই আমি আমার ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকুর মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছি। তার জন্য আমি আমাকেই দোষী করতে পারতাম, যদি না লোকগুলো গায়ে প'ড়ে আমায় বাড়িয়ে তুল্‌ত। এ ছাড়াও যা' আমার সম্বন্ধে জানা আপনার দরকার, সেটা ক্রমে ক্রমেই বলা চলে, এবং সেজন্য আমার বাড়ী পর্য্যন্ত অবশ্যই আপনি যাচ্ছেন। আমাদের নূতন স্কুলের হেডমাষ্টারের পদটা খালি। সেটা ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন, কারণ তার সেক্রেটারী আমি এবং আপনি গোড়া থেকেই আমার আবদারগুলো আশ্চর্য্য রকম বরদাস্ত ক'রে আস্‌ছেন।" অরুণের মুখে একটা করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আপনি আমাকে অত্যন্ত প্রলুব্ধ করছেন। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না যে, আমার কাছে স্নেহের আবদার অপরিচিত নয়, এবং সেগুলি সব সময়ই প্রায় এমন অসম্ভব রকমের যে আমার পক্ষে কেবল ঠেকে শেখাই সম্ভব। আপনার কাছে আমি এইজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি যে, আপনি আমায় ঠেকে শেখার আর একটা সুযোগ দিচ্ছেন,———তবু শিখ্‌তে ত হবেই।" পরেশ বলিল, "তবে আপনি

আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন? ভালই হ'ল। আমাদের বাড়ী, গ্রাম, স্কুল———এ সবের কথা দ্বীমারে হবে, কারণ আমরা এই খুলনায় এসে পড়েছি।"

১৪

অরুণ যখন গ্রামের বাহিরে একখানি খড়ের ঘর তুলিয়া নিরিবিলি বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইল, তখন যদিও পরেশের মনে হইল, ইহার কারণ হয়ত তাহার স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিবার অস্বচ্ছন্দতা অরুণ কল্পনা করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাকে তাহার ইচ্ছায়ই সায় দিতে হইল। সে ইতিমধ্যেই এতটুকু বুঝিতে পারিয়াছে যে অরুণের ভাব-প্রবণতা প্রবল। তাহার সুবিধার জন্য তাহাকে একেবারে স্বেচ্ছায় একেলা থাকিবার স্বত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে রংপুর চলিয়া আসিবার সময় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিল যে, অরুণ তাহার নিজের ঘরে থাকিবে বটে, কিন্তু আহার তাহাকে করিতে হইবে তাহার বাড়ীতে, আর রাত্রে যখন সে ফলটল অথবা একটু দুধই মাত্র খাইবে তখন আর তাহার জন্য বেশী কিছু বেগ পাইতে হইবে না। এ বন্দোবস্ত অরুণের প্রথমটা মনঃপূত না হইলেও তাহাকে শেষটা রাজী হইতে হইল। বৃদ্ধ পিতা রামশরণবাবু যখন আর কিছুতে আপত্তি না করিয়া ঐ একেলা একটা খোলা মাঠে অরুণের থাকিবার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন পরেশকে বুঝাইয়া দিতে হইল যে, অরুণ একটু নিরিবিলি ঈশ্বর-উপাসনা করিতে চায়, তাহাতে তাহাকে বাধা দেওয়া অনুচিত। আর একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বালক জীবন। সে চিরকাল

পিতামাতা ছাড়িয়া তাহার দিদিমার কাছেই থাকিত। তাহার দিদিমা গতবৎসর পরলোক যাওয়ার পর হইতে যদিও সে তাহার দাদামহাশয় এবং মামীমার নিকট যথেষ্ট আদর পাইত, তথাপি পরীর দেশের গল্প বলিবার তাহার আর কেহ জুটিল না। তাই যখন অরুণের নিকট দুই রাত্রি গল্প শুনিয়া আনন্দে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় অরুণের পৃথক হইবার উদ্যোগ তাহাকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ করিয়া ফেলিল।

যে কথাটা কিন্তু কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না, অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামের কাহারও জানিতে বাকী রহিল না, তাহা অরুণের চরিত্র। কাহারও কাহারও ভিতরের জিনিষটা নিদর্শন বিহনেও আপনাপনিই লোকের চক্ষে কেমন প্রতিভাত হইয়া যায়, যাহার উপর বিশ্বাস করা চলে কিন্তু যাহাকে প্রমাণ করা চলে না। অরুণের পক্ষে এটুকু ত বেশই বলা যায় যে, তাহার বাহিরের আড়ম্বর এত কম যে লোকের তাহার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে কিছু সময়েরই কথা। কিন্তু সে সময় না লাগিয়াই যখন গ্রামবাসী তাহার সম্বন্ধে শুধু নিশ্চিন্তই হইল না, তাহার উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিতেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইল, তখন অরুণ একটু আশ্চর্য্য, কিছু বিস্মিতও হইল। কিসে এমন হয় তাহা সে নিজে ত বলিতে পারেই না, অপরের পক্ষেও নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। যাহারা চেষ্টা করিয়া বুঝিল, তাহারা বলিল, অরুণের বাতাসেও যেন একটা আপন-করা প্রীতি আছে, যাহা উপেক্ষা করা বোধ হয় খুবই শক্ত।

এমনই করিয়া গ্রামের একটা কাল্পনিক সুখ্যাতির মধ্যে অরুণের অলসদিনগুলা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল। একদিন অরুণ তাহার সান্ধ্যাহ্নিকে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে, দোলা তাহার প্রভুর বিছানা ঝাড়িতেছিল, এমন

সময় পূবপাড়ার রামেন আসিয়া দরজার বাহির হইতে ডাকিল, "অরুণবাবু"। অরুণ বলিল, "ভিতরে আসুন না।" রামেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই বলিল, "অরুণবাবু আমাদের পাড়ার একটি স্ত্রীলোকের কলেরা হয়েছে, তার কেউ দেখ্‌বার নেই।" অরুণ দড়ির আলনাটা হইতে একটা টুইলের সার্ট ও পশ্চাতে দোলাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাহার কলেরা হইয়াছিল, রামেন পথে যাইতে যাইতে বলিল, সে মৃত হরেন মুখুয্যের স্ত্রী। হরেন মুখুয্যে ও অবিনাশ মুখুয্যে দুই সহোদর, কনিষ্ঠ হরেন মানভূমে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত তাহা নিরবশেষে জ্যেষ্ঠকে দিয়া বাড়ীর শ্রীবর্দ্ধন ও বেশ দু'পয়সা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অরুণ এখানে আসিবার প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে যখন হরেন হঠাৎ হৃদরোগে মারা গেল তখন অবিনাশ কনিষ্ঠের গচ্ছিত টাকা নিজস্ব করিয়া লইয়া সদ্যবিধবা ও তাহার একমাত্র কন্যাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতে গ্রামের কেহ ত কোনরূপ বাধা দেয়ই নাই, এমন কি, এই অবিচারের জন্য কেহ দুঃখিতও হয় নাই। বিধবার কাজে কাজেই অতিকষ্টে দিন চলে। নিজের অল্প স্বল্প কিছু গহনা ছিল, তাহা বন্ধক দিয়া অথবা বিক্রী করিয়া এবং তাহাদের যে জমি জমাটুকু আছে তাহার আদায় হইতে অবিনাশ যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিত তাহাতে বিধবার বাঁচিয়া থাকিবার মতই চলিত। কলিকালে বোধ হয় এমন অবিচার কম হয়। রামেন বলিতে বলিতে এক উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল, "দেখুন না, এই যে ওঁর কলেরা হয়েছে, এখন ওর ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাবার লোক ত নেই-ই তার উপর ঐ তার মেয়েটা ছাড়া কেউ দেখবার লোকও নেই। অবিনা

মুখুয্যেকে আমি আজ বিকালে বললুম, না হয় কালী কবিরাজকেই ডেকে আমুন, লোকটা বল্লে কিনা, 'ডাকা ত উচিতই, যে সে রোগ ত নয়, কলেরার মতই বোধ হচ্ছে; তা' কি করি রামেন, এখন আমার এমন হাত টানাটানি যে আমার কিছু সাহসই হয় না।' ও আবার কাল সকালেই কোথায় কি কাজ আছে বলে' চলে যাচ্ছে। এমন অবিচার-গুলো কেমন দিব্যি সহ্য করতে হয়,—আশ্চর্য্য!"

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল, "ওর চাইতেও অসম্ভব রকমের অবিচার পৃথিবীতে হওয়া স্বাভাবিক, কাজেই এতে দুঃখু করবার তেমন কিছু বোধ হয় নেই।"

রামেন বলিল, "দেখুন, আপনার ঐ হাল-ছাড়া ভাবটা আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। কেন এমন হবে? আমরা কি এর কোন প্রতীকার করতে পারি না?"

অরুণ কিছু গম্ভীর হইয়া বলিল, "হয়ত পারি, হয়ত পারি না। ও হাঙ্গামে না যাওয়াই ভাল।"

রামেন একেবারে চীৎকার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল, "থাক সে কথা এখন। এইটেই অবিনাশ মুখুয্যের বাড়ী"।

বাহিরের সদর ঘর ও পূজামণ্ডপের মধ্য দিয়া গিয়া রামেন যে বাড়ীতে ঢুকিল সেটা অবিনাশেরই বাড়ী। তাহারই দক্ষিণের ঘরটা বিধবা তারা-সুন্দরী ও তাহার কন্যা চারুশীলার থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দুই ঘরের পার্থক্য বজায় রাখিয়া একটা বাঁশের কঞ্চির বেড়া দক্ষিণের ঘরের পাশ কাটিয়া দরজা পর্য্যন্ত আলাহিদার সীমানা

টানিয়া দিয়াছে। তারাসুন্দরীর ঘরের মুখটাও ফিরাইয়া দক্ষিণদিকের বাঁশঝোপটার মুখামুখী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অত বড় বাড়ীটার এতটুকু লইয়াই তারাসুন্দরী নিশ্চিন্ত ছিল দেখিয়া অরুণের মনে হইল, বুঝি বিধবার গ্রাম্যস্বভাবানুযায়ী কলহের প্রবৃত্তিটা ছিল না।

রামেন ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া রুদ্ধ দরজায় ঘা দিল। যে দরজা খুলিয়া দিল তাহাকে ঘরের স্তিমিত প্রদীপটার আলোতে ভাল দেখা না গেলেও অরুণ বুঝিল, এই বিধবার কন্যা এবং এ নিতান্ত বালিকাও নহে। রামেন ঘরে ঢুকিয়াই চারুকে বলিল, "এই অরুণ বাবু। এঁরই কথা বলছিলাম; ইনি থাকতে বৌঠানের শুশ্রূষার ত্রুটি হতে পারে না।" অরুণ একেবারে রোগীর শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রোগীর দিকে চাহিতেই তাহার অবস্থা যে সঙ্কটাপন্ন তাহা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। রোগী "জল" বলিয়া চক্ষু মেলিয়া অরুণকে দেখিয়া বলিল, "কে, রামেন? ভাই—"। রামেন শয্যার দিকে অগ্রসর হইয়া শিয়রস্থ একটা গ্লাস লইয়া তাহার মুখে খানিকটা জল ঢালিয়া দিয়া বলিল, "ইনি অরুণ বাবু বৌঠান, এঁকে এইমাত্র নিয়ে এলাম।" তারাসুন্দরী মাথার কাপড়টা একটু টানিবার চেষ্টা করিতেই অরুণ বলিল, "থাক না, আমাকে দেখে আপনার লজ্জা করবার কি আছে?" তারাসুন্দরী মাথাটা একদিকে হেলাইয়া দিয়া বলিলেন, "ওঁকে আবার কষ্ট দেবার কি দরকার ছিল, রামেন? উনি—"। বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "রামেন বাবু, এ রকম ভাবে বসে থাকলে ত কোন লাভ হবে না। ডাক্তার বাবুকে যদি একবার ডেকে আনেন তবেই কাজ হয়।" রামেন বাক্যব্যয় না করিয়া লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল।

অরুণ ফিরিয়া দেখিল, দোলা দরজার কাছে একখানা পিঁড়ির উপর বসিয়া আছে, বলিল, "দোলা, তোর নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে, তুই একটু ঘুমিয়ে নে। আর একখানা পিঁড়ে জুড়ে নিয়ে শুয়ে পড়্।" "ওকে একখানা পিঁড়ে দিন ত," বলিয়া অরুণ চারুর দিকে ফিরিল। চারু তখন উপুড় হইয়া প্রদীপটা উস্কাইতেছিল, ঘরের কোণ হইতে একখানা পিঁড়ি আনিয়া দোলাকে দিল; তারপর আর একখানা আনিয়া অরুণের নিকট মাটিতে রাখিল। অরুণ হাসিয়া বলিল, "থাক্, আমি খাটের উপরেই বস্‌তে জানি।" চারুও হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

খানিক পরে রোগী হঠাৎ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। অরুণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "উঠ্‌ছেন কেন?" চারু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, পায়খানায় যাবে?" তারাসুন্দরী মাথা নাড়িয়া জানাইলেন —হ্যাঁ। অরুণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সে কি, পায়খানা কোথায়? সেথা কি করতে যাবেন?" চারু বলিল, "মা আমার বারণ শোনে না। তাই আমি এইমাত্র ঘরের বাইরে ঐ কোণটায় একখানা মাল্‌সা পেতে এসেছি। ঐখানে যাবেন।" তখন আর আপত্তি করিবার অবসর ছিল না। অরুণ ও চারু ধরিয়া তারাসুন্দরীকে বাহিরে লইয়া গেল। অরুণ ঘরে ফিরিয়া আসিল, বলিয়া আসিল, "হয়ে গেলে আমাকে ডাক্‌বেন, আমি আবার ধরে' আন্‌ব।"

পায়খানা হইতে আসিয়া তারাসুন্দরী শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিলেন। হাঁটিয়া যাওয়া আসার ক্লান্তি তখন তাহার মুখে বেদনার বিকৃতি ফুটাইয়া দিয়াছে। অরুণ বলিল, "আপনার এ বড় অন্যায়। কলেরার রোগী উঠে গিয়ে বাইরে পায়খানায় যায় এ আমি এর আগে কোথাও দেখি নি।

—" হঠাৎ চারু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "কলেরা! ও মাগো, আমায় ফেলে তুমি যেও নাগো, তা'হলে আমি যে মরে' যাব মা!" সে গিয়া একেবারে তারাসুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিল। রোগিনী তখন ক্লান্তি হেতু জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতেছিল। অরুণ ব্যাপার বুঝিয়া একদিকে যেমন লজ্জিত হইল, অপরদিকে ভীতও হইল। তাড়াতাড়ি চারুর হাত দুইখানা ছাড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ করেন কি, দেখছেন না উনি এতে কষ্ট পাবেন?" চারু মার পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অরুণ বলিল, "আপনি বুঝছেন না। আমি কি ডাক্তার, যে কলেরা বল্লুম, আর কলেরা হয়ে গেল? আমি এর কি বুঝি?" তারাসুন্দরী কন্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ছিঃ মা, এই একটা কথায় তুই কেঁদে ফেল্‌লি। আমি ত বেশ সুস্থ আছি মা।" তাহার গলাটা একটু ধরিয়া আসিয়াছিল। অরুণ দেখিল, সে আচ্ছা বিপদ ঘটাইয়াছে। নিজের উপর রাগটা তখন পরের উপর দিয়াই প্রকাশ্য হইতে পারে। অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া বলিল, "আমি একটা নিতান্ত মূর্খ। কি যে কখন বলি তার কিছু ঠিক নেই। আপনিও ত নেহাৎ কম মূর্খ নন,—আমার এই আল্‌গা কথাটাই বিশ্বাস করে' ফেল্‌লেন। আর ঈশ্বর না করুন, এমন যদি কলেরাই হয়, তা'হলেই কি কাঁদ্‌তে হবে? আজকাল কলেরার রোগী কচিৎ মরে। তা' ছাড়া, উনি ত বেশ চল্‌ছেন ফির্‌ছেন। নাঃ, আমি আর কোন কথা কইব না।" বলিয়া সে গম্ভীর হইয়া তারাসুন্দরীর কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

চারু তথাপি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারাসুন্দরী অরুণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনার কি দোষ? ও নেহাৎ

ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। আপনি কিছু মনে———————।" অরুণ তাহার মুখের নিকট হাত রাখিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। আপনিও নির্ব্বাক হইয়া রোগিনীর কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার কি দোষ? সে কি জানে যে ইহারা রোগ নিরূপণ করিতে পারে নাই? কিন্তু তবু সে নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিল না। সে ইহাও বুঝিল যে, নিজের উপর এই যে আক্রোশ, ইহা এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটিকেই লইয়া নয়,—ইহার পশ্চাতে এমন অন্যায়ের অমানুষিক কতগুলি দৃষ্টান্ত বোধ হয় পড়িয়া ছিল, যাহার স্মৃতির অঙ্গার নীচে পড়িয়া থাকিলেও ত ধূম উদ্গীরণ করিতেছে; তাহারই খানিকটা ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল।

কি জ্বালার সুখই তাহাকে জীবনের পথে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! আবার বিধাতার উপহাসও ত মন্দ নয়,—মার্জ্জনা অযাচিত, সহজ ভাবে আসিয়াই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া কোনদিন অনুতাপ করিবার অবসর দেয় নাই, নূতন নূতন অপরাধের জন্য তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাণ ভরিয়া অনুতাপ করিতে পারে নাই বলিয়াই সে কোন দিন প্রাণ খুলিয়া নিজেকে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

প্রদীপটা নিভু নিভু হইতেছিল, অরুণ উঠিয়া গিয়া সলিতা উস্কাইয়া দিল। এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ হইল। একমুহূর্ত্ত পরে রামেন ডাক্তার বাবুকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ডাক্তার বাবু ঘরে ঢুকিয়াই অরুণকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "রামেন বাবু যখন আপনি এখানে আছেন বলে' বল্লেন, তখনই আমার রোগী সম্বন্ধে কেন যেন আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে। আপনার নামটার সঙ্গে বোধ হয়

মঙ্গল জড়িত আছে।" অরুণ হাসিতে পারিল না; এত বড় মিথ্যাটাকে বাহাল রাখিবার তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। রোগিনীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "বিশেষ বোধ হয় কোন ভয়ের কারণ নেই?" ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "না আশঙ্কার তেমন কথা নয়, serious type নয়!" তারপর রামেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রামেন বাবু, আপনার আমার সঙ্গে আবার যেতে হবে। ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়াতে আরম্ভ করুন।" "বেশ ত", বলিয়া রামেন এক লম্ফে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

১৫

এই দুঃস্থা বিধবার জন্য অরুণের যে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি ছিল, তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। তারাসুন্দরী রোগশয্যায় থাকিতে সে রোজই সে বাড়ীতে যাইত বটে, কিন্তু রোগ হইতে সারিয়া উঠিবার পর অরুণ তাহার কাছে একবারও যায় নাই, অথবা যাইবার জন্য কোন আগ্রহও প্রকাশ করে নাই। রামেনের মুখে মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ লইয়াই সে বেশ নিশ্চিন্ত থাকিত। রামেনের ইহাতে রাগ হইবারই কথা। জীবনটাকে এমন জোর করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতে যে কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না। পরোপকারের এমন একটা সুযোগ অরুণ যে ভাবে অবজ্ঞা ভরে পায়ে ঠেলিতেছিল, তাহা তাহার এক রকম অসহ্যই বোধ হইল। একদিন মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, "অরুণবাবু, ওঁরা আজ ওবেলা উপোস করে' কাটিয়েছে।" অরুণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "কারা ?" রামেন বিরক্তির সুরে বলিল, "কারা আবার কি ? বৌঠান আর চারু।"

অরুণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ও!", তারপর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "উপোস করে' আছেন কেন ?"

রামেন যেন আকাশ হইতে পড়িল, ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "ভাত পাবেন কোত্থেকে যে উপোস করবেন না ? এরকম উপোস ত ওরা প্রায়ই করে' থাকে।" অরুণ অবাক হইয়া বলিল, "বটে ?"

"বটে নয় ত কি ? আপনি কি আর একথা জানেন না ?"

"না, কই আমায় ত কেউ একথা বলে নি।"

তাহাকে আবার এ কথা বলিয়া দিতে হইবে। রামেনকেই কি কেহ বলিয়া দিয়াছিল ? অরুণ একটু ভাবিয়াবলিল, "এ রকম উপোস যদি প্রায়ই করে' থাকে, তবে সে ত অভ্যেস্ হয়ে গেছে। আজ আর তবে নূতন খবর কি ?" উপবাস অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! এ লোকটা বলে কি ? রামেন একটু তীব্রভাবে বলিল, "হ্যাঁ, উপোসটা অভ্যাস হয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু এটা তেমন ভাল অভ্যেস নয়, এ অভ্যেসটা ছাড়াই উচিত।"

অরুণ বলিল, "এ ত আর ইচ্ছা করলেই ছাড়া যায় না। তা, আমায় কি করতে হবে ?"

রামেন এবার রাগিয়া বলিল, "কি করতে হবে তার আমি জানি কি ? আমার বলবার ভাগ, আমি বলে গেলাম।" সে চলিয়া যাইতেছিল, অরুণ বাধা দিয়া বলিল, "এর বোধ হয় একটা প্রতীকার করা দরকার।" রামেন বলিল, "দরকার কি অদরকার তা' আপনি জানেন।" এ সব ত মন্দ

আবদার নয়। ইহারা তাহার উপর এত আবদার করে কি বলিয়া ?

ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানা নোট বাহির করিয়া অরুণ বলিল, "এই দশটা টাকা দিলে বোধ হয় তাদের অনেক দিন উপোস করতে হবে না, কেমন ?" রামেন হাসিয়া বলিল, "এ দিয়ে কি হবে ? বৌঠান কি তা' নেবেন ?" অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "নেবেন না কেন ?" রামেন বলিল, "তাঁরা কি ভিক্ষুক যে আপনি যা দয়া করে দেবেন তাই দুহাত পেতে নেবে ? আমি সেদিন দুটো টাকা দিতে গিয়ে যা' লজ্জাটা পেয়েছি। আমি ও টাকা হাতে করে, সেখানে যেতে পারব না।" অরুণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা'হলে আর আমি কি করবো ? যে খেতে পায় না, সে অযাচিত দান পেলে কেন নেবে না, আমি ত বুঝ্‌তে পারি না।" রামেন বলিল, "আপনি না হয় তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন। আমার কাছ থেকে নেয় নি, আপনি বল্লে হয়ত নিতে পারে।" অরুণ বলিল, "আমি আবার কাকে কি বল্‌তে যাব ? আর আমার কাছ থেকেই বা তিনি নেবেন কেন ? আমার সঙ্গে তাঁর ক'দিনের পরিচয় যে আমি দিলে নেবেন।" রামেন বলিল, "তা, আপনি চলুন না, দেখি বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা কিছু করা যায় কি না।" রামেন এক রকম টানাটানি করিয়াই অরুণকে লইয়া চলিল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। তারাসুন্দরীর উঠানে বাঁশের কঞ্চির মাচাটা লাউর লতাপাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, তাহার তলায় ছায়াটা বেশ জমিয়া গিয়াছে, আর তারই পিছনের বাঁশঝাড়টার মধ্যে সামনে আলোর অসংখ্য ছিদ্র, আর ভিতরে মশকরাজ্যের কল্পনা লইয়া

যথেষ্ট অন্ধকার। ঘরের দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া চারু মহাভারত পড়িতেছিল, তারাসুন্দরী শুনিতেছিলেন। রামেন ও অরুণ ঘরের কোণটা ঘুরিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইতেই চারু গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই একগাল সলজ্জ হাসি লইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। অরুণ দাওয়ায় উঠিয়া তারাসুন্দরীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমায় ভুলে যান নি ত?" চারুর শুষ্ক চোখে মুখে তিরস্কারের বিদ্যুৎ হানিয়া গেল। তাহার দিকে চাহিয়া অরুণ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "ও এত শুকিয়ে গেল কি করে'?" তারা-সুন্দরী একটু হাসিলেন। চারু চোখে অনুযোগ মাখিয়া বলিল, "তা, আপনি কি আর খবর নেন্, বেঁচে আছি কি মরে গেছি? এই ত মার ক'দিন থেকে আবার ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আরম্ভ হয়েছে, কিছু খেতে চায় না, মুখে অরুচি হয়েছে। তবু ভাগ্যিস্ রামেন কাকা মাঝে মাঝে আসে। আপনি বুঝি একবারও আসতে পারেন না, না?" এ তিরস্কারে রামেনের সমস্ত প্রাণটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "আগে দু'খানা পিঁড়ে এনে দে, তারপর তোর যা বকবার আছে বকিস্।" চারু তাড়াতাড়ি দুইখানা পিঁড়ি আনিয়া বসিতে দিল। অরুণ হাসিয়া বলিল, "তোর আবার এত কথা ফুটল কবে থেকে?" চারু বলিল, "ইস্, ফুটবে না ত কি? আপনি অন্যায় করতে পারেন, আর আমি বলতে পারি না বুঝি?" এ মেয়েটা ত জানে না, সে শুধু অন্যায় বলিতে ও অন্যায় করিতেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল!

মধ্য-বৈশাখের রৌদ্রের ঝাঁজটা তখনও যেন বাতাসে মাখান ছিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "চারু, বড্ড গরম পড়েছে। তুই পাখাটা এনে

এদের একটু বাতাস কর্।" তারপর অরুণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমাদের কি একবার মনেও করতে নেই। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব না, কিন্তু তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ, এতে আমাদের উপর একটু মায়া হওয়াই ত স্বাভাবিক।" মায়া? তার ত মায়া থাকিবার কথা নয়। কে না তাহাকে কবে বলিয়াছিল, 'ছিঃ, আপনি পুরুষ আপনার এত দুর্ব্বলতা সাজে না!' সে এই মায়ার কথাই বলিয়াছিল না? চারু পাখা আনিয়া অরুণের পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

অরুণের হঠাৎ একসঙ্গে অনেকখানি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। চারুর হাত হইতে পাখাটা ছিনাইয়া লইয়া আপনিই বাতাস করিতে করিতে বলিল, "আমি যে পুরুষ, পুরুষের আবার মায়া কি?" নিজের কথাটা নিজের কাণে যাইতে সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিলও। তারাসুন্দরী যেন কথাটা বুঝিলেন। অরুণের চরিত্র জানিতে তখন গ্রামে কাহারও বড় বাকী ছিল না। হঠাৎ একটা গুপ্তস্থানে আঘাত পড়িয়াছে বুঝিয়া তারাসুন্দরী কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "তা, তোমার যে আমাদের উপর যথেষ্ট মায়া আছে তা' জানি। কিন্তু যদি মাঝে মাঝে এসে একটু কথা-বার্ত্তা কও, গল্পসল্প কর, তা'হলে আমাদের ভাল লাগে। নিতান্ত একলাটি থাকি বই ত নয়। দিদি এক আধবার আসে, আর সেই যে ও বাড়ীর জগদম্বা পিসী, যে আমার নাম ধরে 'তারা' 'তারা' বলে ডাকে, সে মাঝে মাঝে এসে দেখে শুনে যায়। তা' ছাড়া আমরা মায়ে ঝিয়েই ত একটা মস্ত বড় সংসার", বলিয়া একটু হাসিলেন। রামেন সুযোগ বুঝিয়া তাহার অনুযোগ জানাইল, বলিল, "আমি অরুণবাবুকে কতবার

আস্‌তে বলেছি, তা উনি ঐ একটা লক্ষ্মীছাড়া বেতের চেয়ারে বসে' ভেবে ভেবেই সময় পান না, তা আস্‌বেন কি করে'। এমন হাল-ছাড়া লোক আমি দুনিয়ায় দুটি দেখি নি, যেন আলস্যের অবতার।" এ কথা তারাসুন্দরী আজ প্রথম শুনিল না, তাই বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হইল না, বলিলেন, "যার যা ভাল লাগে। তোমার হয়ত ছুটোছুটি, লাফালাফি করতেই ভাল লাগে, ওর হয়ত চুপটি করে' বসে ধ্যানধারণা করতেই ভাল লাগে। তা'তে আর কি হয়েছে?" অরুণ একেবারে সুস্পষ্ট চমকিয়া উঠিল। ধ্যানধারণা আবার কি? কাহার ধ্যান সে করে? একটা তীব্র শেলের নীচে পড়িয়া সে কি শুধু গোঙাইয়া যাইতেছে না? সে আবার কাহার ধ্যান করিবে? সে ত কোন আশা লইয়া বাঁচিয়া নাই! জীবনের খাতার জমার পৃষ্ঠায় একটা মস্ত বড় সংখ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই বাকী, ওয়াশীল, খরচ প্রভৃতি খুঁজিয়া সেটাকে খোঁয়াইয়া ফেলাই ত শুধু তার উদ্দেশ্য। সে ত কাহারও ধ্যানধারণা করে না। তারাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ত কারও ধ্যান-ধারণা করি না এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে?" তারাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি সন্ধ্যা-উপাসনা কর' না? তাই বলছি।" অরুণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; শুধু কথা বলিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলিল, "ভারি ত করি। ব্রাহ্মণ কি না, একেবারে একটু পূজো আহ্নিক না করলে নিজেকে ফাকি দেওয়া যায় না, তাই।"

চৌকাঠের কাছে বসিয়া চারু এতক্ষণ একদৃষ্টে অরুণের দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ অরুণ যেন তাহা অনুভব করিতে পারিল। চারুর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "চারু বুঝি আমার উপর বড্ড রেগে গেছে,

আসি না বলে ?" রামেন একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তা আর একবার করে' বলতে। আমি এলে পোড়ামুখী একেবারে আমায় জ্বালিয়ে খেত।' কেবল বলত, 'রামেন কাকা, অরুণবাবু আসেন না কেন? তাঁকে ডেকে আনতে পার না?' আবার কখনও কখনও রেগে যেত, বলতো, 'তাঁর ত ভারী অহঙ্কার হয়েছে দেখছি। পৃথিবীতে তাঁর আপনার কেউ নেই কি না, তাই অমন একলা থাকতে ভালবাসেন।' পাগ্‌লী এক এক সময় যা বলে—আশ্চর্য্য, ওর তখন কথার মা বাপ থাকে না।" চারু রামেনের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার রামেন কাকা যে এত বড় বিশ্বাসঘাতক হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তারাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ, ওর একটা 'বাই' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমায় কতবার বলেছে, 'মা রামেনকাকাকে দিয়ে অরুণবাবুকে ডেকে পাঠাও না কেন? তিনি ত আমাদের একবারও খোঁজ করেন না। তিনি ত বেশ লোক,—আচ্ছা, তিনি এমন কেন মা?" ও যে কতবার আমায় জিজ্ঞেস করেছে তার অন্ত নেই। তোমরা এলে ওর একটু ভাল লাগে। কেবল আমার কাছেই সারাক্ষণ থাকে কি না, তাই আমাকে আর তত ভাল লাগে না।" চারু একেবারে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "হ্যাঃ, আমি কি তা' বলেছি নাকি, তুমি যে আমার নামে মিথ্যে মিথ্যে লাগাচ্ছ?" বলিয়াই উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ঐ যা, ওকে কথাটি পর্য্যন্ত বলবার যো নেই। ও যে এত অভিমান নিয়ে সংসারে কি করে' চলবে আমি তাই ভাবি। বে' ত আর হবে না, তাই রক্ষে।" দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তারাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন;

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর গিয়া কন্যার পাশে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চারু মার শেষের কথাটা শুনিয়াছিল, তাই চক্ষের জলে বালিশ ভিজাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রামেন বলিয়া উঠিল, "আরে এ ত আচ্ছা পাগ্‌লি দেখি। এতে কাঁদবার আবার কি হল রে?" বলিয়া সেও ঘরে ঢুকিল।

অরুণ নীরবে বসিয়া এ এক মন্দ অভিনয় দেখিতেছিল না। তারা-সুন্দরীর শেষ কথাটা তাহার প্রাণেও লাগিয়াছিল। তাই নিজেকে আশ্বাস দিয়া বলিল, তা আর হয়েছে কি? এর চেয়েও ত বড় দুঃখ পৃথিবীতে হওয়া সম্ভব। বিবাহ হইবে না তাহাতে আর দুঃখ কি? বিবাহ হইলে চারু যদি আর একজনকে বেশী ভাল বাসিয়া ফেলে! তার চেয়ে বিবাহ না হওয়াই ত ভাল। এরা যেন কেন তা' বোঝে না। বিবাহটা সারিয়া ফেলিতে পারিলেই যেন সকল আপদ চুকিয়া যায়!

১৬

অরুণ মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বাহিরের ঘরে আসিতেই জীবন গোঁ ধরিয়া বসিল, আজ তাহাকে গল্প বলিতেই হইবে। 'বলিব' 'বলিব' করিয়া তাহার যে প্রতিশ্রুতির পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছে তাহাই শুধু সে স্মরণ করাইয়া দিল না, কথা দিয়া কথা লওয়ার অপরাধে তাহার যে ভবিষ্যতে শৃগালজন্ম নিতান্তই সম্ভব, তাহা গম্ভীরভাবে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিতেও সে ত্রুটি করিল না। এবার আর ছলচাতুরী চলিবে না বুঝিতে পারিয়া দোলার আহার শেষ হইলে অরুণ জীবনকেও সঙ্গে লইয়া তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কালবৈশাখীর ছুঁতা লইয়া বাহিরে একটা বিরাট মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। শন্ শন্ শব্দে বাতাসটাও প্রখরতর হইয়া উঠিতেছিল। খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে কনুইয়ের ভর রাখিয়া লেপের নীচে জীবনকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অরুণ বলিল,

"দুই বন্ধু ছিল। তারা ছিল খুব ভারী বন্ধু।"

জীবনের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ও পাড়ার শিবুর সঙ্গে তার যে কত ভাব তাহার প্রমাণ স্বরূপ গতকল্য যে সে চাহিতেই তাহাকে অকাতরে লাটিমটা দিয়াছে, তাহা মনে পড়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা বন্ধুকে কি দিত?" অরুণ বলিল, "কি আবার দেবে?"

জীবন একেবারে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিল, "কেন, আমি যে শিবুকে কত দিই। কতবার মারবেল দিয়েছি, ঘুড়ি দিয়েছি, কালও ত একটা লাটিম দিলুম, সেই যে আপনাকে কাল খাবার সময় বল্লুম। সেও ত আমায় কত জিনিষ দেয়। আমায় যা একখানা নীল কাগজ দিয়েছে, সে মস্ত বড়। তা'তে তিন চারখানা একতেল ঘুড়ি খুব হবে।"

অরুণ বলিল, "তারাও ছোটবেলায় দিত। তারপর তারা যখন বড় হ'ল, তখন আর ও সব দিত না।"

জীবন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি দিত?" এই ফাঁকে বড় হইলে বন্ধুকে কি দিতে হয় যদি শিখিয়া লইতে পারে!

অরুণ বলিল, "তখন আর কিছু দিতে হয় না।—"

জীবন বাধা দিয়া বলিল, "টাকা পয়সাও দিত না?" সে ত

কতদিন মনে মনে স্থির করিয়াছে, বড় হইলে সে যখন অনেক টাকাকড়ি উপার্জ্জন করিবে, তখন শিবুকে কত টাকা দিবে, ভাল ভাল কাপড়, জামাজুতা কিনিয়া দিবে।

অরুণ বলিল, "না। তখন তারা কেউ কারও কাছে কিছু চাইতও না। শুধু সর্ব্বক্ষণ একসঙ্গে থাক্‌ত, একসঙ্গে খেল্‌ত, বেড়াত, একসঙ্গে পড়্‌ত, আর সব চেয়ে তাদের বেশী ভাল লাগ্‌ত একসঙ্গে গল্পসল্প করতে।"

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গল্পসল্প বল্‌ত—কঙ্কা চম্পাবতী কথা, না, 'সাত ভাই চম্পা'র কথা, না, সাত রাক্ষসীর কথা? আপনি সেই সাত রাক্ষসীর গল্প জানেন? তাদের প্রাণ নাকি একটা ডিমের খোসার ভিতর থাকৃত। আচ্ছা, আমাদের দেশে বুঝি রাক্ষস নেই, না মামাবাবু?"

অরুণ বলিল, "না।"

জীবন বলিল, "বাঃ, তবে যে দিদিমা বল্‌ত, আছে; তারা রাত্রে ঘুরে বেড়ায়, আর যে ছেলে সন্ধ্যার পর জেগে থাকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তবে বুঝি তারা আগমপুরে আছে, না?" আগমপুর জীবনদের বাড়ী।

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল, "কোন 'পুরে'ই নেই। তারা আজকাল সব মরে গেছে।"

জীবন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "সব মরে গেছে? একটাও নেই?"

অরুণ বলিল, "না"।

জীবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি করে' মরে গেল ? কেউ তাদের মেরেছিল, না অমনি মরে গেল ?"

'অরুণ হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা। সে আর একদিন বল্‌ব।"

জীবন মিনতির সুরে বলিল, "না মামাবাবু, আজকেই বলুন না।"

অরুণ বলিল, "তবে এ গল্পটা শুন্‌বে না ?"

জীবন সলজ্জভাবে বলিল, "শুন্‌ব, শুন্‌ব, বলুন" ; সে এ গল্পটার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

অরুণ বলিল, "কতদূর বলা হয়েছে না ?"

জীবন কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "সেই যে দুই বন্ধু ছিল।"

অরুণ হাসিয়া ফেলিল। গল্পটায় তেমন কিছুই মনে রাখিবার মত এখনও বলা হয় নাই, তাহাই বালক ইঙ্গিতে বুঝাইল।

দোলা একটা টুলের উপর বসিয়া খাটের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া শুনিতেছিল। গম্ভীরভাবে জীবনের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না, সেই তা'রা খুব গল্পসল্প করতে ভালবাস্‌ত।"

জীবনের ঝাঁ করিয়া সবটা মনে পড়িয়া গেল, বলিল, "কিন্তু কি গল্প কর্‌ত তা'ত বল্লেন না।"

অরুণ বলিল, "এই নিজেদের কথাই বল্‌ত—তারা বড় হলে কে কি করবে, কোথায় থাকবে, তারা আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না তাই একসঙ্গে থাকবে, পরের উপকার করে' বেড়াবে, দেশের জন্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দেবে, কেউ বিয়ে করবে না,—এই সব।"

জীবন শেষের কথাটাই ভাল বুঝিতে পারিল, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে করবে না কেন?"

অরুণ বলিল, "বিয়ে করলে যে তারা ভিন্ন হয়ে যাবে।"

জীবন কথাটা বুঝিতে পারিল না, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভিন্ন হয়ে যাবে কেন?"

অরুণ এই ভীষণ যুক্তিটার ভিতরে অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া সংক্ষেপে বলিল, "বিয়ে করলেই ভিন্ন হয়ে যায়।"

জীবন সহজে ছাড়িতে চাহিল না, আবার একটা নাছোড়বান্দা 'কেন' হাঁকিয়া বসিল।

অরুণ ধৈর্য্য ধরিয়া বলিল, "বিয়ে করলেই বউকে বেশী ভালবাস্‌তে হয় কি না, তাই সে বন্ধুত্ব আর থাকে না।"

জীবন এ কথাটার একেবারে কিছুই বুঝিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া বলিল, "আমার বিয়ে হলে আমি আর শিবুর সঙ্গে থাকতে পারব না?"

অরুণ বলিল, "সঙ্গে থাকতে পার, কিন্তু এখনকার মত ভালবাস্‌তে পারবে না।"

জীবন ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তবে আমি বিয়ে করব না।"

অরুণ বলিল, "হ্যাঁ, সেই ভাল, এখন গল্পটা শোন।"

জীবন "বলুন" বলিয়া অরুণের কোলের কাছে আরও ঘেঁসিয়া আসিল।

অরুণ বলিল, "তারপর যখন তারা আরও বড় হ'ল, তখন সেই দুই বন্ধুর একজন বিয়ে করলে।"

জীবন একেবারে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "এইমাত্র ত আপনি বল্লেন, তারা কেউ বিয়ে করবে না বল্‌ত।"

অরুণ জীবনকে লেপের নীচে চাপিয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবু একজন করলে।"

জীবন রাগিয়া বলিল, "তবে ত সে ভারী বন্ধু!"

অরুণ বলিল, "না, তাতে তার কোন দোষ ছিল না। তার বাপ মা জোর করে' তাকে বিয়ে করালে।"

জীবন বলিল, "তবে ত আর তাদের বন্ধুত্ব রইল না।"

অরুণ বলিল, "না, তাদের তবুও কিছু দিন ছিল।—"

জীবন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে'?"

অরুণ বলিল, "তারা আগে খুব ভালবাস্‌ত কি না, তাই বিয়ের পরও তাদের ভাব রইল।"

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, "দু'জনেই কি বিয়ে করেছিল?"

অরুণ বলিল, "না, শুধু একজন।"

জীবন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তার নাম কি?"

"এই ধর যোগেশ।"

"আর তার বন্ধুর নাম?"

"রমেশ।"

জীবন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তারপর?"

"তারপর রমেশ যখন জান্‌তে পারলে যে পরেশের বিয়ে হয়ে গেছে,—"

জীবন বাধা দিয়া বলিল, "পরেশ আবার কে? তার কথা ত কিছু বলেন নি।"

অরুণ বলিল, "কেন, সেই যে যে বন্ধু বিয়ে করলে।"

জীবন অবাক্ হইয়া বলিল, "সে ত যোগেশ। পরেশের কথা ত আপনি বলেন নি।"

দোলা একটু হাসিল। অরুণও হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যোগেশ। আমারই বল্‌তে ভুল হয়েছে। তারপর রমেশ যখন শুন্‌লে যে যোগেশের বিয়ে হয়ে গেছে—"

জীবন আবার বাধা দিয়া বলিল, "শুন্‌লে কেন? সে কি বিয়ে দেখতে যায় নি নাকি?"

অরুণ বলিল, "না, রমেশ তখন কল্‌কাতায় তার দাদার বাসায় ছিল, তাই যোগেশের বিয়ের কথা জান্‌তে পারে নি।"

জীবন বলিল, "তবে ত তারা আগে থেকেই আলাদা হয়ে ছিল।"

অরুণ কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল, "সে ত দু'একদিনের জন্য, তাতে আর কি আসে যায়? আবার ত তারা একসঙ্গে থাকৃত।"

জীবন বলিল, "ও বুঝেছি, তারপর?"

অরুণ তৃতীয়বার আরম্ভ করিল, "তারপর রমেশ যখন শুন্‌লে যে তার বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেছে, তখন তার বড় কষ্ট হ'ল।

জীবন অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অরুণ বলিল, "রমেশ বুঝ্‌লে কি না যে এইবার থেকে তারা ভিন্ন হয়ে যাবে, আর ত যোগেশ তাকে তেমন ভালবাস্‌বে না।"

জীবন বুঝিতে পারিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তারপর ?"

অরুণ বলিল, "রমেশের শুনে খুব কষ্ট হ'ল। যোগেশ আগেকার মত তাকে আর ভালবাস্‌বে না, এ কি তার কম কষ্টের কথা। আবার আর একটা মুস্কিলও হ'ল। রমেশ বুঝ্‌লে যে এখন তারও কেবল যোগেশকেই ভালবাস্‌লে চল্‌বে না, তার বৌকেও ত ভালবাস্‌তে হবে, তা' না হ'লে যোগেশকে আগেকার মত ভালবাসা যাবে না।"

জীবন গম্ভীরভাবে বলিল, "হুঁ"।

অরুণ বলিতে লাগিল, "তাই সে ঠিক করলে যে যোগেশের বৌকেও সে ভালবাস্‌বে। সেদিন থেকে যোগেশের বউর কাছে প্রায়ই যেত, তার হাতে কাটা সুপারি খেত, তার সঙ্গে গল্প করত। এমনি করে' রমেশ তার সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব করলে।"

হঠাৎ জীবন মাঝখানে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেশের বউ কি খুব সুন্দর ছিল ?"

অরুণ বলিল, "হ্যাঁ। তারপর, এ রকম বন্ধুত্ব করতে করতে রমেশ তাকে খুব ভালবেসে ফেল্লে।"

জীবন আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে ত বেশ হ'ল। রমেশ খুব বুদ্ধিমান ছিল, না ?"

অরুণ প্রথম হাসিয়া ফেলিল, তারপর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, খুব বোকা ছিল।"

জীবন অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

অরুণ বলিল, "অন্যের বৌকে যে ভালবাস্‌তে নেই, তা' সে মোটেই জান্‌ত না।"

জীবন আরও বেশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, অন্যের বৌকে ভাল-বাস্‌তে নেই কেন?"

অরুণ বলিল, "সে ভালবেসে কি হবে? তাকে ত আর সে বিয়ে করতে পারবে না।" শেষের কথাটা সে অনেকটা প্রশ্নের মতই বলিল।

জীবন বুঝিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত। রমেশ তবে ভালবাস্‌লে কেন?"

অরুণ উত্তরে যেন অনেকটা আপনাকেই বলিল, "সে এমন যে তাকে না ভালবেসে থাকা যায় না।"

জীবন এইবার পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ও, তারপর?"

অরুণ একটু থতমত খাইয়া গেল; একটু ভাবিয়া বলিল, "তারপর রমেশ যখন দেখ্‌লে যে সে যোগেশের বৌকে খুব ভালবাসে, একেবারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখন তার ইচ্ছা হ'ল সেও তাকে বিয়ে করবে।"

জীবন সাশ্চর্য্যে বলিল, "তা' কি করে' হয়? যোগেশ ত একবার তাকে বিয়ে করেইছে, রমেশ আবার তাকে কি করে' বিয়ে করবে? রমেশ বুঝি জান্‌ত না যে, একজনকে দু'জনে মিলে বিয়ে করতে পারে না?"

অরুণ মনে ব্যথা পাইল। সমাজের প্রতাপ এ বালক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; তাই সমাজের দাসত্বের গর্ব্বে সেও তাহাকে উপহাস করিতে ছাড়িল না! একটু হাসিয়া বলিল, "তা', তারা সকলেই খুব বন্ধু ছিল কি না, তাদের সকলের ইচ্ছা হলেই পারত।"

জীবন বলিল, "তবে আমার ইচ্ছা হ'লে আমার বৌকেও শিবু বিয়ে করতে পারবে?"

এ কি সমাজের প্রশ্ন, না, তার নিজের? অরুণ বলিল, "শুধু তোর ইচ্ছা হলেই হবে না, তোর বৌ তাতে রাজী হলে ত।"

জীবন অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেশের বৌ রাজী হয়েছিল?"

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা দম্‌কা বাতাস সোঁ করিয়া ঘরে ঢুকিল। অরুণ বাহিরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দোলাকে পায়ের দিকের জানালাটা বন্ধ করিতে বলিল। দোলা জানালা বন্ধ করিয়া দিলে তাহাকে আলোটা জ্বালিতে আদেশ করিয়া অরুণ বলিল, "হাঁ, কি বল্লি?"

জীবন অরুণের গালের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "যোগেশের বৌ তাতে রাজী হয়েছিল?"

অরুণ বলিল, "না, তা' সে রাজী হবে কেন?"

জীবন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, সে কি রমেশকে ভালবাস্‌ত না?"

অরুণ দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না"।

জীবন একটু রাগিয়া বলিল, "কেন? আপনি ত বল্লেন রমেশ তাকে ভালবাস্‌ত।"

অরুণ বলিল, "রমেশ ত বাস্‌তই। সে খুব বাস্‌ত, সব চেয়ে বেশী ভালবাস্‌ত, প্রাণ দিয়ে বাস্‌ত, এত বাস্‌ত যে—," সে থামিয়া গেল।

জীবন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অরুণের মুখের দিকে চাহিল, নিম্নস্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "এত বাস্‌ত যে—?"

অরুণ বলিল, "খুব ভালবাস্‌ত। কিন্তু রমেশ ভালবাস্‌লে কি হয়, সে ত রমেশকে ভালবাস্‌ত না।"

জীবন বলিল, "কেন? সে বুঝি খুব মন্দ ছিল?"

অরুণ বলিল, "না। সে মেয়েমানুষ কি না, দু'জনকে ভালবাস্‌তে পারে না, তাই শুধু যোগেশকেই ভালবাস্‌ত।"

জীবন ঝাঁ করিয়া বলিল, "কেন, শুধু রমেশকে বাস্‌লেই ত হ'ত।"

দোলা হাসিয়া বলিল, "দূর তা' কি হয়, তুই নেহাৎ ছেলেমানুষ।"

অরুণ চিন্তিতভাবে বলিল, "সে যে যোগেশের বৌ; সে যোগেশকে ছেড়ে রমেশকে ভালবাস্‌বে কেন?"

জীবন ইহাতেও দমিল না; চোখে মুখে বিস্ময় ফুটাইয়া বলিল, "বাঃ, রমেশ যদি তাকে বেশী ভালবাসে?"

অরুণ অত্যধিক গম্ভীর হইয়া বলিল, "তবুও না।"

জীবন ঠিক বুঝিল না; বলিল, "তারপর?"

অরুণ আবার একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তারপর সে যখন রাজী হ'ল না, তখন রমেশের মনে ভয়ানক কষ্ট হ'ল। সে দুঃখে, কষ্টে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোথায় চলে' গেল কেউ জান্‌তে পারলে না।"

জীবন রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

অরুণ বলিল, "তারপর অনেকদিন পরে একদিন যোগেশ আর তার বউর কাছে খবর এল যে,—

দোলা খাটের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "যে, রমেশ বিষ খেয়ে মরেছে, না?"

অরুণ বাহিরের প্রকৃতির মতই মুখখানাকে অন্ধকার করিয়া বলিল, "না! তার চেয়েও ভয়ানক,—রমেশ বিয়ে করেছে।"

মুহূর্ত্তকাল তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর উপরি উপরি বজ্রনির্ঘোষে জীবনের অস্ফুট 'তারপর'টা মোটেই শোনা গেল না।

১৭

সুধী তখন গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ীতে। পিয়ন আসিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া গেল। শিরোনামার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুধীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি লেপাফা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া সে পড়িল, অরুণ লিখিয়াছে।

"আমার চিঠি পাইয়া জানিতে পারিবে, আমি বাঁচিয়া আছি। রংপুর হইতে আসিয়া অবধি এখানেই আছি। এখানে কি ভাবে আছি প্রভৃতি বাজে খবর দিবার কোন প্রয়োজন নাই। আজ চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্য, তোমাকে খবর দেওয়া যে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ দিন। যাহার সঙ্গে সমাজমতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইব, সে এক দুঃখী ও দরিদ্র বিধবার একমাত্র কন্যা; নাম চারুশীলা।

"কেন হঠাৎ বিবাহ করিতেছি, তাহা জানিতে তোমার কৌতূহল হইতে পারে। নীলিমার স্বামী হিসাবে সে প্রশ্ন করিবার তোমার অধিকার নাই; আমার বন্ধু বলিয়া সে কথা সংক্ষেপে তোমায় বলিব।

"আমার সাধ হইয়াছে আমায় কেহ 'স্বামী' বলিয়া ডাকে। আমি যাহাকে বিবাহ করিতে যাইতেছি, হয়ত সে মনে প্রাণে আমায় 'স্বামী' বলিয়া ডাকিবে না, হয়ত তোতাপাখীর মত কোন এক সন্ধ্যায় সমাজে মুখ হইতে নামটা কাড়িয়া লইয়া অনর্গল বকিয়া যাইবে। তবু আমার

সে অর্থহীন বাচালতা শুনিতে সাধ হইয়াছে। আমার বুঝি সাধ হয় না একটা অপার্থিব মধুরতার মোহ লইয়া থাকিতে? রাম সীতা অভাবে মায়াসীতা গড়িয়াছিলেন, আমিও স্ত্রী অভাবে সঙ্গিনী গড়িয়া লইব। লোকে ত বলিবে, আমি তার স্বামী, সেও ত দশজনের কাছে পরিচয় দিবে আমি তার স্বামী!

"আর, আমি এখন জীবনটাকে ফাঁকি দিতে চাই। ঠিক করিয়াছি, মিথ্যা বলিব, মিথ্যা ভাবিব, মিথ্যা করিব। তাই গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার বোঝার নীচে সটান পড়িয়া যাইতে চাই, যেন সে মিথ্যা ঠেলিয়া আর সত্য বাহির হইতে না পারে। 'সত্য' 'সত্য' করিয়া অনেক দিন বৃথা উত্তেজনায় মাতিয়া ছিলাম। হঠাৎ একদিন আচম্কা কার ঘায়ে মোহের মুখস খসিয়া পড়িল, সমাজ হাঁকিয়া বলিল, 'আমি আগাগোড়াটাই মিথ্যা, তুই সত্য পাবি কোথায়?' চাহিয়া দেখিলাম, আমি মিথ্যা, আমার সম্বন্ধগুলি সব মিথ্যা, আমার চিন্তাভাবনা সব মিথ্যা। তখন ভুল ভাঙ্গিল, বুঝিলাম, যেখানে সবই মিথ্যা সেখানে মিথ্যাটাই সত্য। তাই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাকে একটা প্রকাণ্ড সত্য বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়াছি। প্রার্থনা, ইহাতেই যেন জীবনের ফাঁকিটা সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

"মনে করিব, চারু আমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, এবং আমিও তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। প্রথমটার ভুল হয়ত সহজে ভাঙ্গিবে না; দ্বিতীয়টার শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। একদিন নির্জ্জন সন্ধ্যায় বুকের জ্বালাটা হঠাৎ প্রাণের ভিতর বিদ্যুদ্দাহ জ্বালাইয়া জানাইয়া দিবে, আমি চারুকে সব চেয়ে ভালবাসি না। সে সন্ধ্যাই আমার সামাজিক জীবনের সন্ধ্যা।

তারপর যে রাত্রিটা আসিবে, তখন ত ভয়ঙ্কর অন্ধকার, সে অন্ধকারে আমি কোথায় এককোণে বুক চাপিয়া পড়িয়া আছি, তাহা তোমরা কি করিয়া দেখিবে? বিবাহের পর কেবল সেই সন্ধ্যাটার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব। হয়ত সেদিন একটা মেঘ্লা দিন হইবে, বাদলের মোহ লইয়া সন্ধ্যাটাকে এড়াইয়া যাইব। আর অন্যদিনের মত সে দিনও একটা মিটমিটে আলো আমার পাশে জ্বলিয়া আমার সন্ধান বলিয়া দিবে,—হতচ্ছাড়া জীবনের নিরাশার সান্ত্বনা লইয়া দিব্য বাঁচিয়া তা' যদি হয়, তবে তোমরা তখন আমায় মনে রাখিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করিয়ো না, এই আমার ভিক্ষা। আর যদি কোনদিন কথা বলিবার সুযোগ না হয়, সেইজন্য এখনই বলিয়া রাখিলাম।

"আর কাহাকেও আমার এ চিঠির মর্ম্ম অথবা বিবাহের কথা জানাইয়ো না। তোমাকে আমার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলাম, পারিলে আসিও।

অরুণ।"

বারবার পত্রখানা পড়িয়া সুধী হীরেন্দ্রের হাতে নীলিমার নিকট চিঠিখানা পাঠাইয়া দিল।

নীলিমা তখন রান্নাঘরে বসিয়া মাছ কুটিতেছিল, হীরা আসিয়া পত্র হস্তে দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি রে?"

হীরা বলি, "তা জানি না, দাদার নামে এসেছে, দাদা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে।"

নীলিমার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, চাপা আগ্রহে বলিল, "উপরের হাতের লেখাটা দেখি।" দেখিয়া সে চিনিল অরুণের লেখা; মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল, "মাটিতে রাখ পড়ব'খন।"

হীরা চলিয়া গেলেই সে বঁটিটা কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পতিত পত্রখানার দিকে সাহগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই সে বিরক্তি ভরে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি যে কচ্ছি তার ঠিক নেই, মাছটা না কুটেই পড়বার কি দরকার হ'ল!" নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সে আবার মাছ কুটিতে বসিল। এ আগ্রহ কেন? আগ্রহ দেখিয়া মনে হয় অরুণের সম্বন্ধে আরও কিছু তার নূতন জানিবার বাকী আছে। নীলিমা মনে মনে হাসিল। তারপর হঠাৎ তাহার মনে হইল, আছে, একটা কথা জানিবার শুধু বাকীই নাই, যথেষ্ট ঔৎসুক্যও আছে, বোধ হয় প্রয়োজনও আছে। এ কথা স্বীকার করিতে কেন তাহার লজ্জা হইবে? সে কি মানুষ না, তার কি মানুষের প্রাণ, মানুষের হৃদয় নয়? তবে সে স্ত্রীলোক বটে!

মাছ কোটা হইয়া গেলে হাত ধুইয়া পত্রখানা বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া সে পশ্চিমের ঘরে ঢুকিল, তারপর দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া খাটের উপর গিয়া বসিল।

নীলিমার মনে পড়িয়া গেল—সে ত কতবারই মনে পড়িয়াছে, তবে আজ তা' বিশেষ করিয়া মনে পড়িবারই কথা—সে এই খাটেই ঠিক এই দিকটায় এমনই করিয়া বসিয়া প্রথম তাহার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিল, অরুণ তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। সেদিন তাঁর খুব ঘৃণাবোধ হইয়াছিল না? হ্যাঁ, সেদিনকার সে ভাবটা এখনও কল্পনা করিয়া আনা চলে।

পত্র পড়া শেষ হইতেই নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া পত্র পাঠের ভাণ করিয়া ভাবিতেছিল,—কেহ

হয়ত জানালা দিয়া দেখিয়া গিয়া থাকিবে। কেন যেন তাহার আজ কান্না পাইল। নীলিমার ইচ্ছা হইল, দরজা, জানালা সর্ব বন্ধ করিয়া সে কিছুক্ষণ মাটিতে পড়িয়া কাঁদে। আজ সে কি হারাইল, বুকের কোন্ জায়গাটা আজ এমন ভাবে হঠাৎ খালি হইয়া গেল? অরুণ ফাঁকি দেওয়ার কথা লিখিয়াছে না? সে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিবে, আর নীলিমা আজ এই মুহূর্ত্তে ফাঁকির শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজ একটা কি ফাঁকিই ধরা পড়িয়া গেল! অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানা একটা তোরঙ্গের পিছনে ফেলিয়া দিয়া ঘোমটাটা বড় করিয়া টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। এ ঘর ছাড়িয়া সে কোথায় চলিয়াছে?

রান্নাঘরে ভাতের ফেন ও হাত ধোওয়া জল ফেলিবার যে নর্দ্দমাটা ছিল, সেখানে একটা জলপূর্ণ কলসী টানিয়া লইয়া নীলিমা সমস্ত জলটা ঢালিয়া ফেলিয়া শূন্য কলসী কাঁখে করিয়া জল আনিতে চলিয়া গেল। তাহার মনে পড়ে, সেই যে অরুণে ও তাহাতে একটা বৃথা দ্বন্দ্ব করিয়া এক রাত্রি বেশ অশান্তিতে কাটাইয়াছিল, তারপর হইতেই একটা প্রাণ লইয়া খেলিতে তাহার কেমন একটা অস্বাভাবিক পিপাসা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আর একটা হৃদয়ে তাহার জন্য ভালবাসা রহিয়াছে, জানিতে কেন সে তেমন সুখবোধ করিত, তাহার কারণ সে খুঁজিয়া ত দেখেই নাই, খুঁজিলেও পাইত কিনা সন্দেহ। কেমন যেন তা' ভাল লাগিত। অরুণ তাহাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসা পাইতে চায় আর নীলিমা তাহা দিতে পারে না, এই তিন সর্ত্ত মিলিয়াই না তার জন্য অত সুখের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই যেদিন নীলিমা জানিতে পারিল

অরুণ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, সেদিন আর তার আনন্দের অবধি ছিল না, সেদিন কি এক আনন্দে গর্ব্বে তাহার সর্ব্বশরীরে তরঙ্গ নাচিয়া উঠিয়াছিল, সে সেদিন বালিকার মত ছুটাছুটি করিয়া তাদের রংপুরের সে পাড়াটা ঘুরিয়া আসিয়াছিল, আনন্দে সে রাত্রে তার ঘুম হয় নাই। আজ তাহার জ্ঞান হইল, যদি তৃতীয় সর্ত্তটা সরাইয়া লওয়া হয়, তবে সমস্ত আনন্দ বুদ্বুদের মত কোথায় মিশাইয়া যায় অতখানি জায়গা খালি পড়িয়া গিয়া অশান্তি ও নিরানন্দে প্রাণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে। সে এক-দিকের হিসাব লইয়াই ব্যস্ত ছিল, অন্যদিকের জমাখরচ খতাইয়া দেখিবার তার অবসর হয় নাই। আজ হঠাৎ কে আসিয়া খরচের পৃষ্ঠাটা তাহার চোখের সামনে খাঁ করিয়া ধরিয়াছে; দেনায় সে যে বিকাইয়া যাইতে পারে এ সম্ভাবনায় তাই তাহার আজ বড়পুকুরের ঘাটে কলসী কক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমগাছের ছায়ার তলায় কালো শান্ত জলটার ঈঙ্গিত তাহার নিকট গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ঘাটের শেষ ধাপটায় স্নান করিয়া উঠিয়া সুরমা আর্দ্র বস্ত্র নিঙড়াইতে-ছিল; ডাকিয়া বলিল, "বৌদি' ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পিসীমারা ত চলে গেছেন, নেবে এস না।" নীলিমা নামিয়া আসিয়া কলসীটা জলে ভাসাইতেই সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কমলার চিঠি এসেছে বুঝি বৌদি'? আমায় চিঠিটা দেখাবে না?"

নীলিমা ঘোমটার ভিতর হইতে সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কই?"

"সেই তোমার কাছে পড়ে' ছিল, তুমি যখন মাছ কুটছিলে।"

তবে সুরমা তাহাকে চিঠিটা পড়িবার সময় দেখে নাই।

নীলিমা মাথা নামাইয়া বলিল, "সে আমার চিঠি নয়।" সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "সুদা'র বুঝি ?" নীলিমা বলিল, "হ্যাঁ"। "তবে তোমার কাছে পড়ে' ছিল কেন ?"

"তার চিঠি আমার কাছে থাকতে নেই ?" বলিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া একটু টিপিয়া হাসিল। হাসি দিয়া ঢাকিয়া কত বড় একটা মিথ্যা কথাই সে বলিয়া ফেলিল! সুরমাও হাসিয়া বলিল, "থাকতে নেই কেন, তবু—"। একটু থামিয়া বলিল, চিঠিখানা কে দিয়েছে বৌদি' ?" নীলিমা জল ভরিতে ভরিতে বলিল, "তার এক বন্ধু।"

"তুমি তাকে চেন বুঝি ?"

নীলিমা জল ভরিয়া কলসীটা কাঁখে লইয়া বলিল, "হ্যাঁ"। সোপান বাহিয়া উঠিতে উঠিতে তাহার মনে হইল সুরমার শেষ প্রশ্নটার উত্তরে সে আর একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। কাল ও উত্তরটা চলিত বটে, আজ আর তাহা চলে না। সুরমা বলিল, "দাঁড়াও না বৌদি', আমিও ত যাচ্ছি", বলিয়া গামছা দিয়া চুল ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে উঠিয়া আসিল। গামছাটা চুলে পাকাইয়া খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করে' তাকে চিন্‌লে ? তুমি কি তাকে দেখেছ ?" নীলিমার অত্যন্ত রাগ হইল, সে আসামী নাকি যে, তাহাকে সকলে মিলিয়া জেরা আরম্ভ করিয়াছে! চলিতে চলিতে নীলিমা বলিল, "হ্যাঁ"।

"কোথায় দেখ্‌লে ?"

"রংপুরে।"

"সে বুঝি তোমাদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, গেল পুজোয় আমি যখন রংপুরে যাই, তখন সেও গিয়েছিল।"

বোধ হয় বেশী বলা হইয়া গেল, এত না বলিলেও চলিত!

সুরমা ঝাঁ করিয়া বলিল, "তবে ত অরুণদা'ও তাকে চেনে, না? সেই ত তোমায় রংপুর নিয়ে যায়।"

মেয়েটার আস্পর্দ্ধা দেখ। সুরমার দিকে বিদ্যুদ্দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "হ্যাঁ"।

সুরমা কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা বৌদি', অরুণদা' হঠাৎ অমন হয়ে গেল কেন?"

নীলিমা বলিল, "কেমন হয়ে গেল?"

"এই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেল, কোন খোঁজখবর দিলে না। সকলেই তাকে এত ভালবাসে, তবু সে সকলকে ফেলে এমন চলে গেল কি করে?"

নীলিমা বলিল, "তার আমি কি জানি?" বাঃ, সে ত সত্য কথাই বলিয়াছে। কাল হয়ত সে ইঙ্গিতে জানাইতে পারিত—সে কারণটা কিছু কিছু জানে, আজ আর সে কি করিয়া বলিবে, কেন অরুণ সকলের মায়া ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে?

সুরমা গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি, পুরুষমানুষ বড় নির্দ্দয়।"

নীলিমা বক্রদৃষ্টিতে হাসি মাখাইয়া বলিল, "কেন, ক্ষিতীশ বাবু তার প্রমাণ নাকি?" বলিয়া নীলিমা যেন অনেকটা শান্তি পাইল। তার পরিহাস করিবার দিন এখনও তবে শেষ হয় নাই!

সুরমা "যাও" বলিয়া নববিবাহিত জীবনের গরিমায় মুখ ফিরাইয়া লইল। নীলিমা আর কোন কথা কহিল না।

দুপুরবেলা আহারাদি শেষ হইলে পশ্চিমের ঘরে ঢুকিয়া নীলিমার

সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, এখন সে নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ করিতে পারে। দরজা বন্ধ করিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা সে জানিত না। কাজ-কর্ম্মের অবসর হইলে সে আর অপরের কাছে মুখ দেখাইতে সাহস করিবে না, ইহাই সে জানিত। একটা উদ্দেশ্য তার ছিল বটে, অরুণের চিঠিখানা আর একবার পড়িতে হইবে। মনে হইল, তাহার ভাগ্যটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। চিঠিটা যেখানে পড়িয়াছিল সেদিকে এক পা অগ্রসর হইয়াই নীলিমা থামিয়া গেল। তাহার ভাগ্য! তাহার ভাগ্য! তাহার ভাগ্য অরুণের ঐ চিঠিটায় লেখা আছে নাকি! অরুণ কি তার ভাগ্যবিধাতা? ছি, ছি, এ কথা তার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও কি করিয়া আসিল? হায়, হায়, সে কি পাপেই না ডুবিয়া গিয়াছে! অরুণের উপর ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, "সে এত বড় পিশাচ, তা আমি জান্‌তুম না।" মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া সে তার অনুতপ্ত হৃদয়ের জ্বালা চক্ষের জলে ভিজাইতে বসিল। আজ তার বড় গর্ব্ব চূর হইয়াছে। এক হাতে ভর রাখিয়া অধোবদনে সে ভাবিতে লাগিল,—আজ তার সকল গর্ব্ব চূর হইয়াছে; আজ সে সকলের উপহাসের লক্ষ্য, সর্ব্বাপেক্ষা হীন, সকলের চেয়ে দীন। আজ তার সকল অযোগ্যতা এক সঙ্গে দামামা বাজাইয়া উঠিয়াছে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে শব্দ পৌঁছিয়াছে, আজ তার প্রতি লোমকূপে কি যেন কাণা-কাণি, জানাজানি হইয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে নীলিমা শিহরিয়া উঠিল।

হঠাৎ তুফান উঠিল। বাহিরে ছেলের দলে কোলাহল জাগিয়া উঠিল। রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া কাপড়, জামাগুলি তুলিয়া লইবার

জন্য হাঁকাহাঁকি, দৌড়াদৌড়ি, সোরগোল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে কর্ত্রীরা চীৎকার করিয়া শাসন ও সতর্ক করিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্ত বাতাসের মুখে পড়িয়া সে উদ্ধত কোলাহল কোথায় উড়িয়া গেল, শুধু কতগুলি অস্ফুট শব্দ মৃদু গুঞ্জন করিয়া প্রাঙ্গনের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি আসিল; ঘন ঘন বিদ্যুতের চকমকি খেলিয়া খেলিয়া ঘন ঘন বজ্রপাত আহ্বান করিতে লাগিল। আকাশে ও মর্ত্তে একটা প্রলয়-সন্ধি আরম্ভ হইল।

ঘরের ভিতর জানু পাতিয়া যোড়করে নীলিমা বলিতেছিল, "প্রভু, আজ আমার বড় বিপদ। যে গর্ব্বকে আশ্রয় করে' বড় সুখে এতদিন বেঁচেছিলাম, সে গর্ব্ব আমায় চূর্ণ হয়েছে। আর আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব?" আরও কত কি তাহার আজ প্রাণ খুলিয়া বলিবার ছিল— কত অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা এই সুযোগে ভগবানকে জানাইয়া দিবার ছিল, শুধু ভাষার অভাবে বলা হইল না। অন্তর্য্যামীরও তাহার ভাষায় তাহার দুঃখ শুনিবার প্রয়োজন ছিল।

ছাতি মাথায় ভিজিতে ভিজিতে পাদুকার শব্দ করিতে করিতে সুধী আসিয়া পশ্চিমের ঘরে রুদ্ধ দরজায় ঘা মারিল, ডাকিয়া বলিল, "দরজা খোল।" নীলিমা চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুধী ছাতি বন্ধ করিয়া ঢুকিতেই নীলিমা বলিল, "বড্ড ভিজেছ যে, তাড়াতাড়ি কাপড়টা ছেড়ে ফেলে দাও।" সুধী ছাতিটা একপাশে রাখিয়া দরজায় খিল লাগাইতেছিল, চমকিয়া নীলিমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। নীলিমা মাথা নীচু করিয়া আবার বলিল, "কাপড়টা ছাড়", বলিয়া আলনা হইতে একখানা কাপড় লইয়া আসিয়া নতমস্তকে আবার দাঁড়াইল। সুধী

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আমার পানে একবার চাও দেখি।" নীলিমা দৃষ্টি আরও নত করিয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। সুধী বলিল, "মাথা তোল, চাও", বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া জোর করিয়া মাথা তুলিয়া ধরিল। অমনি সিন্ধুর পঞ্চশাখার ন্যায় নীলিমার গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল; সুধীর চোখে চোখ রাখিয়া ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "কেন?" সুধী মাথা ছাড়িয়া দিল, এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল, "কাঁদছিলে কেন?" নীলিমা কোন উত্তর করিল না, মাথা নীচু করিয়া আবার মাটি খুঁড়িতে লাগিল। এমন নির্ভরের কান্না সে অনেকদিন কাঁদে নাই,—স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া আজ কাঁদিতে পারিলে বড় ভাল হইত। সুধী খাটের উপর গিয়া বসিয়া বলিল, "অরুণের বিয়ে ত ১৬ই, আর—", নীলিমা মাথা তুলিয়া চাহিতেই সে থামিয়া গেল, ভ্রূ ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "কেন তুমি জান না? হীরে তোমায় তার চিঠি দিয়ে যায় নি?" নীলিমা মাথা হেলাইয়া জানাইল "গিয়াছে"। সুধী আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আমাদের যেতে বলেছে, কিন্তু———।" নীলিমা বাধা দিয়া বলিল, "না, শুধু তোমায় নিমন্ত্রণ করেছে।" সুধী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে বল্‌লে? আমাদের দুজনকেই ত যেতে বলেছে। বলে নি? চিঠিখানা কোথায় দেখি।" নীলিমা তোরঙ্গের নীচে যেখানে অরুণের পত্র পড়িয়াছিল সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া সেটা লইয়া আসিল। মাথা নীচু করিয়া পত্রখানা টানিয়া আনিবার সময় চৌকিটা তাহার কপালে সজোরে বাজিয়া গেল। আহত স্থানে হাত দিবার জন্য হাত তুলিয়াই সে হাত নামাইয়া ফেলিল, অপমানে তাহার মুখখানা গাঢ় রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। সুধী বলিল, "ওখানে

চিঠিটা ফেলে রেখেছিলে কেন? আর রাখবার জায়গা পাওনি?" নীলিমা উত্তর না করিয়া পত্রখানা সুধীর হাতে দিল। সুধী পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, চিঠির ভাবে ত বোঝা যায় যেন আমাকেই কেবল নিমন্ত্রণ করেছে।" নীলিমা বিজয়ের গর্ব্ব লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সুধী ভাবিয়া বলিল, "তা, তুমিও যাবে?" নীলিমা খাটের একপাশে বসিয়া বলিল, "আমায় নিমন্ত্রণ করেনি, আমি যাব কেন?" সুধী বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে। তুমি ত ইচ্ছা করলে যেতে পার। তবে তোমার যদি যেতে প্রবৃত্তি না হয়, তা'হলে আমি না হয় একাই যাব। নীলিমা ঝাঁ করিয়া ফিরিয়া বলিল, "কি বল্লে?" তাহার স্বামী বুঝি 'প্রবৃত্তি' না বলিয়া 'সাহস' বলিতে যাইতেছিল! সুধী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বল্‌ছিলাম যে, যদি তোমার ইচ্ছা না হয় তবে তুমি থাকতে পার, আমি একাই———।" নীলিমা বাধা দিয়া অনাবশ্যক জোরের সহিত বলিল, "আমিও যাব।" সুধী হাসিয়া বলিল, "তবে ত ভালই হয়।" নীলিমা একদৃষ্টে সুধীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সত্য বল্‌ছ?" আজ আর সে কিছু গোপন করিতে পারিবে না; কি আগুন যে তাহার বুকের ভিতর জ্বলিতেছিল, তাহা তাহার স্বামী কি করিয়া জানিবে? সুধী অবাক হইয়া গেল, একটু ভীতও হইল, তাই আবার হাসিয়া বলিল, "সত্যি না কি মিথ্যে?" নীলিমা মুখ ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল, —তার কান্না পাইতেছিল। আজ সে কেবল অপমানের বোঝা টানিয়া বেড়াইবে নাকি? তাহার স্বামী একবার জিজ্ঞাসাও করিল না, অরুণের বিবাহে তাহার যাইতে সাহস হয় কি না, কেবল স্মিতহাস্যে কঠোর পরীক্ষার নির্ব্বাক আহ্বান জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সুধী বলিল, "যাবে ত যেন বুঝ্‌লুম। বিয়ে ত এদিকে পরশু। কালই তা'হলে রওনা হওয়ার যোগাড় দেখতে হয়।" নীলিমা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কাল আমি যেতে পারব না।" সুধী অবাক হইয়া বলিল, "তবে বিয়ে দেখবে কি ক'রে?" নীলিমা একটু রাগিয়া বলিল, "আমি কি বিয়ে দেখতে যাব নাকি?" সে মনে মনে ইহার পূর্ব্বেই মাথা পাতিয়া হার মানিয়া লইয়াছিল। সুধী এবার আর অবাক হইল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কবে যাবে?"

"এই পরশু, তরশু।"

সুধী বলিল, "তাই।" তবু নীলিমাকে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

১৮

সেদিন শুভরাত্রি। সন্ধ্যার পর হইতে একটা একমাত্র সানাই বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছিল। অবিনাশ মুখুয্যের বৈঠকখানায় একটা বহুদিনের পুরাতন ঝাঁড়ে নিতান্ত শীর্ণকায় মোমবাতিটা নিভু নিভু জ্বলিতেছিল। সেখানে অবিনাশ নিজে ও পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া হাসি-তামাসা, গল্পসল্প করিতেছিলেন, আর একটা হুঁকা কতগুলি লোলুপ দৃষ্টি ও প্রসারিত হস্ত এড়াইয়া হস্ত হইতে হস্তান্তরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল।

অরুণ তারাসুন্দরী ও কাদম্বিনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া সন্ধ্যার ছায়াটা আসিয়া পড়িতেই উঠিয়া দাঁড়াইল। তারাসুন্দরীর দিকে

চাহিয়া বলিল, "বৈঠকখানায় একবার যাই, রাজেনবাবুরা এসেছেন। প্রাঙ্গন পার হইয়া সদরের দরজার কাছে আসিতেই একটা কালো ছায়া তাহার সম্মুখে পড়িল। রামেন একটা ট্রাঙ্ক স্কন্ধে করিয়া আনিয়া বলিল, "সুধী বাবু সপরিবারে এসেছেন। তিনি বৈঠকখানায় ব'সে আছেন।" কিছুদূরে যে আপাদমস্তক আবৃত একটা মূর্ত্তি থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অরুণ বলিল, "আচ্ছা, তাঁর স্ত্রীকে আমিই বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাব। আপনি ট্রাঙ্কটা পশ্চিমের ঘরে রেখে আসুন।" নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন,———এস।" রামেন চলিয়া গেল।

অরুণ ক্ষিপ্রপদে নীলিমার কাছে গিয়া বলিল, "তুমি? তুমি কেন এখানে? তোমায় ত আস্‌তে বলি নি'। সুধী কোথায়?" নীলিমা মৃদুস্বরে বলিল, "সদরে।" অরুণ বাড়ীর ভিতর অগ্রসর হইয়া বলিল, "এস, আমার সঙ্গে এস।" তারাসুন্দরী পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। অরুণ নীলিমাকে পশ্চাতে করিয়া দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "সুধী বাবু আমার বন্ধু, তিনি সপরিবারে এসেছেন। ইনি তাঁর স্ত্রী।" 'তাঁর'টা যেন একটু বেশী জোর দিয়া বলা হইল। নীলিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ইনি আমার শাশুড়ী"। নীলিমা ভূমিষ্ঠ হইয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি লইল। তারাসুন্দরী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সাধ্বী, সতী হও মা"। অদূরে মাদুরটা দেখাইয়া বলিলেন, বস মা, এইখানে বস।" অরুণ উঠানে নামিয়া দোলাকে ডাকিল, একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাচ্ছি, আমায় যদি এরা খোঁজে ত বলিস্।" দোলা

জিজ্ঞাসা করিল একটা আলো নিয়ে যাবে না, বড্ড অন্ধকার যে ?" অরুণ না বলিয়া চলিয়া গেল।

অরুণ চলিয়া গেলে তারাসুন্দরী বলিলেন, "সুধী কোথা রইল ? তাকে যে দেখছি না।" নীলিমা মস্তক নত করিয়া বলিল, "বৈঠকখানায় বুঝি।" তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "আহা, ওকে যে খাবার দাবার কিছুই দেওয়া হ'ল না। দিদি, ও দিদি—" কাদম্বিনী উত্তরের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

"অরুণের বন্ধু সুধী এসেছে, সদরে বসে' আছে। এনে একটু জলটল খাইয়ে দাও। আমি জপটা সেরে নি'।"

কাদম্বিনী বলিলেন "দিই"।

তারাসুন্দরী তখন নীলিমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তোমরা এত দেরী করে' এলে যে ? বিয়েতে তোমরা এলে কত আহ্লাদ হোত। আমরা ত তাই মনে করেছিলাম।"

নীলিমা বলিল, "এই আসি আসি করে' আস্‌তে দেরী হয়ে গেল, মা। খবরটাই দেরীতে গিয়েছিল। যেদিন খবর পৌঁছিল, তার দুদিন পরেই বিয়ে। আমাদের আবার চলাফেরা করা যা দুর্ঘট। নৌকা সব সময় পাওয়া যায় না,—বিশেষ এই ঝড়বৃষ্টির দিন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা যাক, এসেছ যে এইতেই সুখী। আমরা ভেবেছিলাম, বুঝি আর এলে না।" তারপর ঘরের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "চারু এদিকে একবার আয় ত মা। কে এসেছে দেখ্‌বি আয়।"

চারু ঘরের মধ্যে বসিয়া প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছিল, মার ডাক

শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। অন্ধকারে মাদুরের উপর কে একজন বসিয়া আছে চিনিতে পারিল না। যে বসিয়াছিল সে যে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে বুঝিতে পারিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে মা?" তারাসুন্দরী বলিলেন, "অরুণের বন্ধু সুধী, যাকে আসতে অরুণ চিঠি লিখেছিল, তার স্ত্রী। তোর দিদি হয়।" চারু প্রণাম করিতে গেল। নীলিমা খপ্ করিয়া তার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া বসাইল। চারুর বাঁ হাতটা নিজের কোলের নিকট দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমা বলিল, "আমি তোমার কি হই, চারু?" চারু একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, "দিদি। মা যে বল্লেন।" তারপর ধীরে ধীরে মুখখানা ফিরাইয়া নীলিমার দিকে একবার চাহিয়াই চোখ নামাইবা বলিল, "চলুন আমরা ভিতরে গিয়া বসি। মা এখানে জপ করছেন কি না।" নীলিমা বলিল, "তাই চল।" তারাসুন্দরীকে বলিল, "আমরা দু'বোনে ভিতরে গিয়ে গল্প করি, কেমন মা?" তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা যাও মা। কিন্তু তুমি ত এই মাত্র এলে; হাত পা ধুয়ে একটু জলটল খাও, তারপর গল্প করতে বোস।" চারু বলিল, "সে সব আমি দেখব 'খন। দিদি তুমি এস", বলিয়া নীলিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

পশ্চিমের ঘরের পিছনে হাতমুখ ধুইবার নির্দ্দিষ্ট স্থানটায় নীলিমাকে লইয়া গিয়া চারু বলিল, "দিদি, একটু দাঁড়াও, আমি একটা আলো আর এক ঘট জল নিয়ে আসি।" সে চলিয়া গেল। নীলিমা অন্ধকারে একা একা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এ আবার কোন পালা অভিনয় করিতে সে আসিল। এতদিন বিজয়ের পালা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে, এই-

বার বুঝি হারিবার পালা। এ ত সকলেরই হয়, তবে বোধ হয় এমন করিয়া হয় না, চারুর মত এমন না জানিয়া ঘা মারিয়া বোধ হয় কেহ জিতিয়া যায় না। চাকা বহুক্ষণ ঘুরিতেছিল—সে জানিত না, এইবার একেবারে নীচে আসিয়া পড়ায় জানিতে পারিয়াছে। ইহাও সে সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে গুপ্ত একটা শরশয্যার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, সেটা নিতান্তই মর্ম্মভেদী। আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা এইবার সে শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। আর তার শতবিদ্ধ দেহ লইয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, তবু বুঝি উঠিতে হইবে!

চারু আসিয়া আলোটা দূরে রাখিয়া জলের ঘটি লইয়া নীলিমার কাছে আসিল; আসিয়া মিনতির সুরে বলিল, "দিদি, আমি তোমার পা ধুইয়ে দেব দিদি।" নীলিমা তাহার হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইতে গিয়া বলিল, "দূর পাগ্‌লী, তা' কি হয়। আমায় ঘটিটা দে।" চারু একেবারে কাঁদিবার মত হইয়া বলিল, "দিদি, আমার যে তুমি ছাড়া দাদাও নেই, দিদিও নেই। আমি যে কারও পা ধুইয়ে দিই নি, আমার বড় ইচ্ছা করে। দিই না দিদি?"

নীলিমা হাসিয়া বলিল, "দিবি ত দিবি, আবার মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্। কেন, পরশু রাতে কারও পা ধুইয়ে দিস্ নি, মিথ্যাবাদী?"

লজ্জায় চারুর মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল। তারপর প্রফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে দিই, কেমন?"

নীলিমা ঘটিটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, ছিঃ। এখন থেকে কত পা ধুইয়ে দিতে হবে, তার জন্য ভাবনা কি? এখন শীগ্‌গীর করে' চল্, তোকে অনেক কথা বল্‌বার আছে।"

উভয়ে গিয়া পশ্চিমের ঘরে একটা চাটাই পাতিয়া বসিল। চারু বসিয়াই উঠিয়া পড়িল, বলিল, "আঃ সব ভুলে যাই। তোমায় যে খেতে দিতে হবে।" নীলিমা হাতটা ধরিয়া টানিয়া বসাইল, হাসিয়া বলিল, আজ আর কি কিছু মনে থাকে! তা তুই বোস্, আমি একেবারে তখন খাব। বোস্ না, একটু গল্পসল্প করি। আজ আর ত তোর দেখা পাওয়া যাবে না। কাল ত চলেই যাব।" চারু বলিল, "ইস্, যাবে বৈ কি। তোমায় যেতে দিলে ত যাবে। তুমি চলে গেলে আমি থাক্‌ব কি করে'?" নীলিমা বলিল, "পোড়ারমুখী, তোর সাধ মেটে না। একজনকে আঁচলে বেঁধেছিস্, তাতে বুঝি হয় না, আবার আমাকেও রাখতে চাস্। কিরে আমার অষ্টগুণের রাধা!" বলিয়া একটা ঠোনা দিল। চারু লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও, তুমি যা তা বল। এমন কর্লে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।" বালিকা জানে না, আজ সে যা তা বলিতেই আসিয়াছে, তাহাকে আদর করিতে আসে নাই। কিন্তু নিজের উপর রাগ করিয়া অপরকে এমন বিঁধিয়া বিঁধিয়া বলা উচিত হয় না। কিন্তু আজ আর সে তা' শুনিবে না, আজ সে রাক্ষসী হইয়া আসিয়াছে। চারুর মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা আর ন্যাকামো করতে হবে না। মনে মনে বেশ ভালই লাগ্‌ছে, উপরে দেখান হচ্ছে যেন কত রাগ। ওলো, আমারও এককালে তোর দিন ছিল। কিন্তু ছিল কি? তাহার বিবাহেও কি কোন বিলুপ্তা হত-ভাগিনী তাহার পাশে পড়িয়া থাকিয়া দরিদ্র হৃদয়ে এমনই আর্ত্তনাদ করিয়াছিল?

চারু কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল, "আচ্ছা দিদি, তোমাদের

বাড়ী এক গ্রামেই, না ?" নীলিমা না বুঝিবার ভাণ করিয়া বলিল, "তোমাদের আবার কার কার ?" চারু বলিল, "যাও, তুমি যেন কিছু বুঝ্‌তে পার না।" নীলিমা হাসিয়া বলিল, "তুই আবার কবে থেকে ইসারায় কথা বল্‌তে শিখ্‌লি লা ?" চারু ভেঙচাইয়া বলিল, "আহা, নিজে বড় সাধু কি না। তুমি বুঝি কিছু জান না ?" তারপর নীলিমার হাতখানা টানিয়া বলিল, "বল না দিদি।" নীলিমা একটু অন্যমনস্ক-ভাবে বলিল, "হ্যাঁ"।

"এক পাড়ায় ?"

"এক পাড়ায়, ঠিক পাশাপাশি।"

চারু আহ্লাদে বলিল, "বেশ হয়েছে। তবে ত তোমার সঙ্গে রোজ দেখা হবে।" নীলিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা' কি করে' হবে লো ? তুই থাকবি তোদের বাড়ী, আমি থাকব আমাদের বাড়ী। এক বাড়ী ত নয়।" চারু বলিল, "কেন আমি রোজ রোজ যখন কাজ থাকবে না, তোমার কাছে যাব।" নীলিমা বলিল, "ইস্‌, এখনই যে শ্বশুর বাড়ীর কাজ কর্ম্মের জন্য পাগল হয়েছিস্‌। তখন কত কাজ করিস্‌ দেখা যাবে।" একটু থামিয়া আবার বলিল, "তা' কি হয়। তোর 'তিনি'ই বা আস্‌তে দেবেন কেন ? তুই যা সুন্দর, যদি কেউ তোকে দেখে বিয়ে করতে চায় ?" চারু একেবারে অবাক হইয়া গেল, বলিল "ছিঃ।" বটে ! ঊর্দ্ধে ভ্রূযুগল তুলিয়া চারু আবার বলিল, "কি যে পাগলের মত বল দিদি, তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দায়।" নীলিমা হাসিল না, মনে মনে বলিল, 'আজ আমার সঙ্গে কথা কইতেই হবে।'

এমন সময় কাদম্বিনী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "চারু, ওঠ ত মা, সুবী তোমায় দেখতে চায়।"

চারু তাড়াতাড়ি এক হাত ঘোমটা টানিয়া কাদম্বিনীর সহিত বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া ঘোমটাটা ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি, তোমার বরকে দেখে এলুম।"

নীলিমাও হাসিয়া বলিল, "সে কি লো, তুই তাকে দেখতে গিয়েছিলি, না সে তোকে দেখতে এসেছিল।"

চারু হাসিয়া বলিল, "দুই। আমি বুঝি চোখ বুজে থাকব। আমি বুঝি আর দেখতে জানি না।"

নীলিমা বলিল, "হয়েছে, বোস্ এইবার বল্ দেখি, দেখে কি বল্লে।

চারু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল্লে, উঃ কি সুন্দর, যেন সগু ডানা-কাটা পরী।" তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, "কি বল্লে তা' শোনবার জন্য বুঝি আমি আবার সেখানে দাঁড়িয়েছিলুম।" সে সত্য সত্যই আসিবার সময় এই উদ্দেশ্যে দরজার কাছে একটু দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কিছুই শুনিতে পায় নাই, সে কথা ত আর বলা চলে না। কিছুক্ষণ নীলিমার দিকে চাহিয়া চারু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "দিদি, তোমায় এই সবুজ সাড়ীখানায় ভারী সুন্দর মানায়।"

নীলিমা বলিল, "সত্যি, দেখিস্ যেন আবার তোর বর না আমায় দেখে ভুলে যায়, তোকে ছেড়ে শেষটা আমায়ই না পছন্দ করে ফেলে।"

চারু তাহার দিদির ক্রমাগত কুব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মুখরার মত বলিল, "করুক না, আমার ত বয়ে যাবে।"

নীলিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "বটে, আর আমিও যদি তাকে পছন্দ করে ফেলি।"

চারু তবুও জব্দ হইল না, বলিল, "ইস্, তার আবার এত ভাগ্যি হবে।"

নীলিমা একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এ মেয়েটাও তাহাকে বিঁধিতে জানে! চারুর গালটা টিপিয়া দিয়া বলিল, "খুব যে কথা শিখেছিস্। এর মধ্যেই এত আপনার হয়ে গেল, সবে ত দুদিন মাত্র বিয়ে হয়েছে। তোর যে বেশী বেশী আবদার দেখছি।" কথাটা যে সত্যসত্যই কেবল মাত্র তাহার আপনার প্রাণের আর্ত্তনাদ, তাহা বুঝিতে পারিয়া নীলিমা থামিয়া গেল। সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বলিল, "তোকেও আজ এমনি একখানা সবুজ সাড়ী পড়িয়ে দেব, তোকেও বেশ মানাবে; তখন তুই-ই জিত্‌বি।" সলজ্জ কৃতজ্ঞতায় চারু মস্তক আনত করিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমায় কেবল বেশী বেশী আদর দাও।"

নীলিমার দেহটা আকণ্ঠ যেন ধিক্কারে ভরিয়া গেল তথাপি ওষ্ঠপ্রান্ত দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "তোর বরের মত ত আর নয়।"

চারু একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে ত আমায় ভারী ভালবাসে!"

নীলিমা চারুর আনত মুখের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল, "না বাস্‌লে বুঝি অমনি সেধে কেউ বিয়ে করে?"

চারু বলিল, "তিনি ত আর সেজন্য বিয়ে কর্‌লেন নি। আমার ত বিয়ে হোত না, আমরা খুব গরীব কি না, তাই ত করলেন।" ছল্‌ ছল্‌ চক্ষে সে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নীলিমার তথাপি দয়া হইল না, বলিল, "ছিঃ, ও কথা ভাব্‌তে নেই। কে তোকে বল্লে, তোর বিয়ে হোত না সেই জন্য উনি দয়া করে' তোকে বিয়ে করেছেন। ভাল না বাস্‌লে কি কেউ সেধে বিয়ে করতে পারে।"

চারু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "না, পারে না! তাই ত বাসর রাত্রে একটি কথাও বল্লে না, সারারাত খাটের উপর বসে' ভেবে ভেবে কাটালে।

নীলিমা একেবারে উচ্চৈঃস্বরে "বাঃ" করিয়া উঠিল, তারপর সহানুভূতির স্বরে বলিল, "কেন?"

চারু জলভরা চোখে বলিল, "কেন সে কি আর আমি বুঝ্‌তে পারি নি? আমায় বিয়ে করেছেন বলেই ত ওঁর এত দুঃখু। আমার সঙ্গে তিনি কথা কইবেন কেন, আমি তাঁর কে?" বলিয়া সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলিমার আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাই চারুর কান্না দেখিয়া তাহারও যেন কান্না পাইল। চারুর মুখখানাকে দুই হাত দিয়া টানিয়া আনিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঃ, আজ যে তোর শুভরাত্রি চারু, আজ কি চোখের জল ফেল্‌তে আছে! তুই তাকে চিনিস্‌ না। সে বড় ভাবুক, তাই যখন তখন অমনি অমনি ভাবে। তোর মত মেয়েকে কি সে না ভালবেসে থাকতে পারে। ভগবান তা'হলে তাকে ক্ষমা করবেন কেন? সে কি তোর মূল্য জানে না,

ভাবিস্? সে তোর আমার চেয়ে ঢের বেশী বিদ্বান, ঢের বেশী বুদ্ধিমান।

তারাসুন্দরী উঠান হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "চারু তোর দিদিকে নিয়ে খেতে আয়। সে যে আজ সারাদিন না খেয়ে আছে, রাত ত কম হ'ল না।"

নীলিমা বলিল, "ঐ ছাখ্ মা ডাকছে, চল্, খেতে যাই, আমার ক্ষিদে পেয়েছে," বলিয়া নিজ অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছাইয়া দিল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে নীলিমা বলিল, "আয় চারু তোকে আজ ফুলরাণী করে' সাজিয়ে দিই।" তার সেই চিক্‌চিকে কালো রেশমের মত চুলের গোছাটায় তেল জল দিয়া নীলিমা বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া সযত্নে বেণী পাকাইয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তারপর ফুলশয্যার ফুল হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল লইয়া খোঁপার চারিদিকে বসাইয়া মধ্যে তাহার নিজের মাথা হইতে চিরুণীখানা খুলিয়া লইয়া গুঁজিয়া দিল; ফুলের মালা গাঁথিয়া খোঁপায় বেড়িয়া দিল; ট্রাঙ্ক হইতে একটা সাদা গাউন আর একটা রেশমের বোড়িস্ বাহির করিয়া গায়ে পরাইয়া দিল; এক খানা সবুজ সাড়ীও ট্রাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া তার উপর জড়াইয়া দিল; এক শিশি লেভেণ্ডার বাহির করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিল; কপালে টিপ্ পরাইয়া দিল; তারপর মুখে একটা পান গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "ছাখ্ ত, এইবার কেমন দেখতে হয়েছে, ঠিক যেন একখানি প্রতিমা।"

চারু লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বলিল, "ঠিক তোমার বোন্‌টির মত, না?"

নীলিমা তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানা তুলিয়া কপালে চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বলিল, এইবার আয়, তোকে ফুলশয্যায় তোর বরের পাশে শুইয়ে আসি।"

উত্তরের ঘরের একপাশে একটা খাটের উপর শুভ্র বিছানায় পা দোলাইয়া বসিয়া অরুণ একান্তমনে কি ভাবিতেছিল। দরজায় খট্ করিয়া শব্দ হইতেই সে মাথা তুলিয়া দেখিল, নীলিমা অবগুণ্ঠনবতী চারুর বাহু ধরিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে—সেই সবুজ সাড়ী পরা, সেই সিঁথায় সিন্দুর, সেই কাণে দুল।

নীলিমা দাওয়া পর্য্যন্ত ঠিকই আসিয়াছিল, চৌকাঠের কাছে আসিয়াই থামিয়া গেল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ও ভিটার ঘরগুলি অত্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। চারুকে ঠেলিবার ভাণ করিয়া সে যে নিজেই ইতঃস্ততঃ করিতেছিল, ইহা পাছে চারুর নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সে চোখ বুজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। চারুকে বিছানার পার্শ্বে লইয়া গিয়া সে নতমস্তকে মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর মাথা না তুলিয়াই বলিল, "তোমার ধন তোমায় দিলাম, এইবার আমি যাই?" আবার এক সুদীর্ঘ মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতান স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, আর দূরে গ্রামের ওপার হইতে একটা কোকিলের কুহুরব মন্থর ও মন্দীভূত হইয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। সে মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল।

নীলিমা যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতেই অরুণ বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও"। নীলিমা দাঁড়াইল।

অরুণ বলিল, "একটা কথা বলে' যাও। তুমি কোন দিন আমায় 'তুমি' বলে ডাক নি, আজ ডাকলে কেন?" নীলিমা তীরের মত ফিরিয়া দাঁড়াইল; অপাঙ্গে বিদ্যুৎ চাহনি জ্বালাইয়া সে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার ইচ্ছা";—বলিয়াই ঘরের চমক ভাঙ্গিয়া সে তড়িৎবেগে বাহির হইয়া গেল।

আবার এক মুহূর্ত্তকাল বাহিরের ঝিল্লীরব স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, আর দূরে গ্রামের ওপার হইতে সেই কোকিলটার কুহুরব তেমনই মন্থর ও মন্দীভূত হইয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

সম্পূর্ণ।

ছেলে মেয়েদের উপযোগী কয়েকখানি পুস্তক।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

১। **সাঝের ভোগ**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, রূপকথা সংগ্রহ। কবিত্বে ভরা। প্রায় ৫০ খানি ছবি আছে। মূল্য ১৲

২। **রোমের গল্প**—শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ, রোমের ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ।৵০

৩। **আবার বলো**—শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, বাঙ্গলার রূপকথা—স্বপ্নপুরী। মূল্য ৷৵০

৪। **কিশোরী**—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, অল্প বয়স্কা বালিকাদের জন্য শিক্ষাপ্রদ করুণ কাহিনী। মূল্য ১৲

৫। **বৈশাখী**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ, রূপকথা সংগ্রহ—অসংখ্য ছবি আছে। এণ্টিকে ছাপা।

মূল্য ১।০।

শিশুতোষ সিরিজ

আশ্বিন হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইতেছে।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲

প্রতি সংখ্যা ।৵০ ।

আজ দেশের চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যে সকল কাজের সূচনা না করিলে জাতীয়-জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না, আজ সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অত্যন্ত অভাব, ইহা সর্ব্ববাদী চ এই অভাব পূরণ করিতে পারে. না। আমরা "শিশুতোষ সিরিজ" নাম দিয়া যে ধরণের বই প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছি, ইহা দ্বারা কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকিবে তাহা নয়। এই সকল বই পড়িয়া তরুণ বালকবালিকার চিত্তবৃত্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

জাতীয় জীবনের যাহারা ভবিষ্যৎ, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই যে আয়োজন, ইহার সার্থকতা নির্ভর করে প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকের সহযোগিতার উপর। আমরা বই ছাপাইয়া লাভবান্ হইব এই উদ্দেশ্য লইয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হই নাই। শিক্ষা বিস্তারই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের এই চেষ্টায় কি বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রত্যেক শিক্ষক সম্পূর্ণ সায় দিবেন না? যদি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শিশুতোষ সিরিজের বইগুলি স্থান পায়, তবেই এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের চেষ্টা সার্থক হইবে।

শিশুতোষ সিরিজের প্রথম বই—আশ্বিন সংখ্যা

পৃথিবীর জন্ম

এই অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া পৃথিবীর জন্ম হইল, দিন রাত্রি, সূর্য্য চন্দ্র, এই সকলের জীবনী ও কার্য্যাবলী শিশুদের উপযোগী সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিশুতোষ সিরিজের দ্বিতীয় বই—কার্ত্তিক সংখ্যা

প্রকৃতির পরাভব

সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে;—সে এক ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু ফলে প্রকৃতিকেই ধীরে ধীরে পরাভব স্বীকার করিতে হইতেছে। এই যুদ্ধের বিবরণ হইতেছে—বিশ্ব-সভ্যতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস।

শিশুতোষ সিরিজের তৃতীয় বই—অগ্রহায়ণ সংখ্যা

কানুর কীর্ত্তি

একটি সুন্দর গল্প—গরীবের ছেলে কানু কি করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিল।

শিশুতোষ সিরিজের চতুর্থ বই—পৌষ সংখ্যা

আর্য্য ও অনার্য্য

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ। এই বইখানি পড়িয়া ছেলে মেয়েরা আর্য্য অনার্য্যদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিবে যাহা শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া কোন দিনই তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সেই পুরাণ দেশের কথা আবার তাহাদের স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিবে।